বাংলা
ভাষাপাঠ
চতুর্থ শ্রেণি
বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১
সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী চতুর্থ শ্রেণির বাংলা ভাষাপাঠ প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-এই নথিদুটিকে অনুসরণ করে নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়েছে। প্রথাগত ব্যাকরণচর্চার বদলে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অভিমুখ ও পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বইটিকে শিশুকেন্দ্রিক এবং মনোগ্রাহী করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রস্তুত করতে প্রভূত শ্রম অর্পণ করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত পাঠ্যবই প্রকাশ করে সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করে। এই প্রকল্প রূপায়ণে নানাভাবে সহায়তা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী মানুষের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

মানিক ভট্টাচার্য
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা,পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক রচিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি।

তৃতীয় শ্রেণির 'পাতাবাহার' -এর মধ্যেই ছিল ভাষাপাঠ অংশটি। চতুর্থ শ্রেণিতে স্বতন্ত্র বই হিসেবে 'ভাষাপাঠ' প্রকাশিত হয়েছে। প্রথাগত ব্যাকরণচর্চা থেকে আমাদের এই 'ভাষাপাঠ' ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতির উপর নির্ভর করে আমরা চেষ্টা করেছি ব্যাকরণচর্চার অভিমুখের পরিবর্তন আনতে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন, ষষ্ঠ তল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু
অপূর্ব সাহা স্বাতী চক্রবর্তী ইলোরা ঘোষ মির্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

শংকর বসাক

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

কথাবলার যন্ত্রপাতি
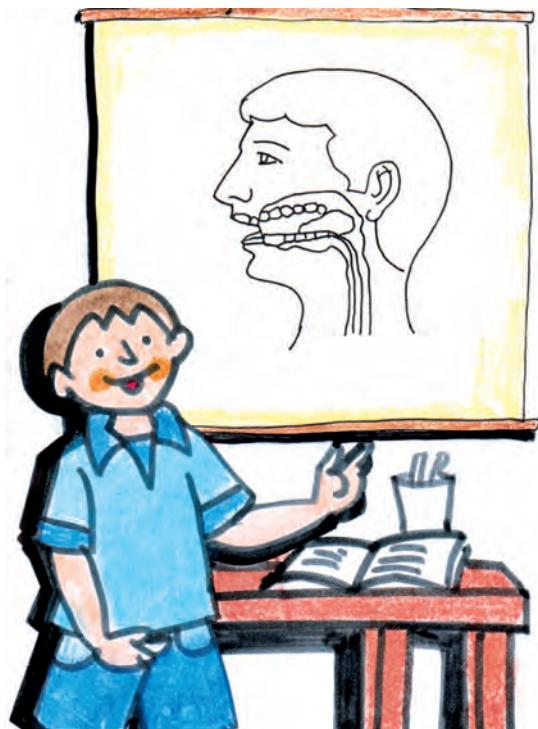
ক্লাসে ঢোকার আগে শুনতে পেলাম সবাই নতুন ক্লাসে উঠে জমিয়ে গল্প করছে। আমি নিঃশব্দে ক্লাসে ঢুকলাম। আমাকে দেখে সবাই চুপ করে গেল।

আমি বললাম, এই যে তোমরা কথা বলছিলে, বলো তো কথা বলতে গেলে কী কী দরকার হয়?

সবাই বলল, বন্ধু লাগে।

বন্ধু তো জীবনে সবসময়ই লাগে। যদি বন্ধুর মতো বন্ধু হয়। আমি তা বলিনি। আমি জানতে চাইছি, কথা বলতে গেলে আমাদের শরীরের কোন কোন অঙ্গের প্রয়োজন হয়?

কৌশিক বলল, গলা লাগে।

রাবেয়া বলল, মুখ লাগে।

আর কৃশানু বলল, মাথা লাগে।

আমি বললাম, বেশ। তোমরা সবাই এক অর্থে ঠিক বলেছ। তবে কৃশানু যে বলল মাথা লাগে, সেটা খুব ঠিক কথা। কিন্তু কেমন করে লাগে, তা পরে বলব। কেননা সেটা বলতে গেলে আরো কিছু জিনিস তোমাদের জানতে হবে। তবে কৌশিক আর রাবেয়া যা বলল, তারও আগে কিছু জিনিস লাগে। আমি পর পর বলব, তবে তার আগে ব্ল্যাকবোর্ডে একটা ছবি আঁকি—
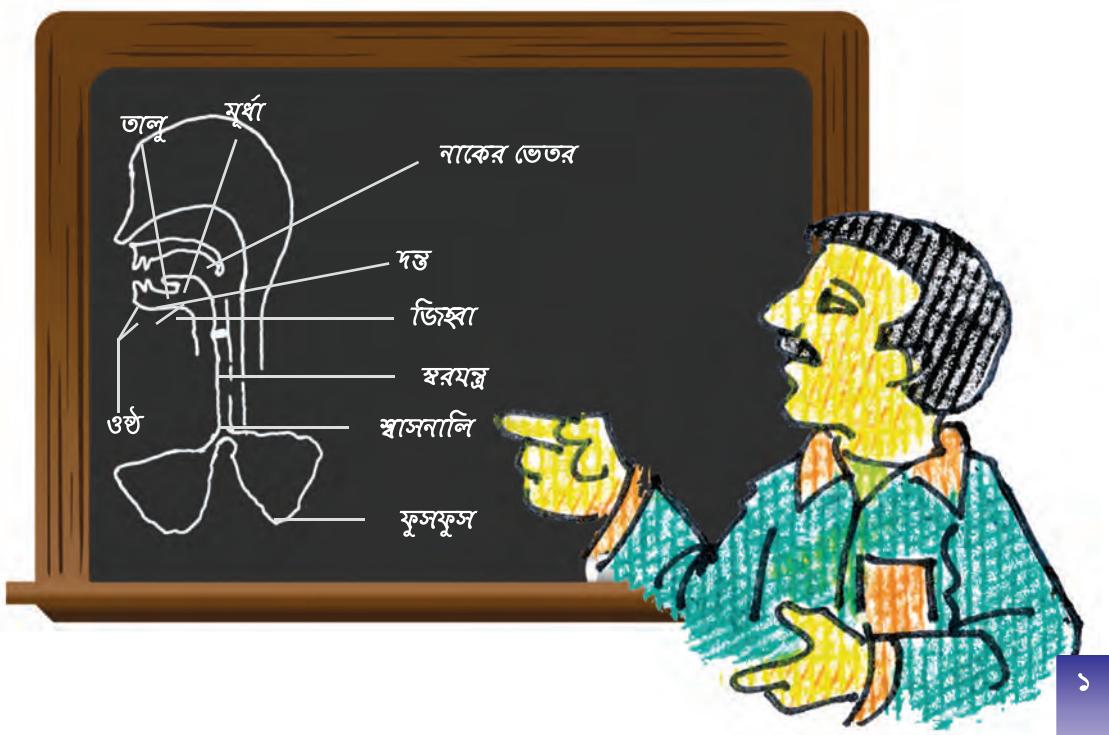
ছবিটা দেখে সবাই খুব অবাক হয়ে গেল।

অবাক হওয়ার বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই যন্ত্রপাতিগুলো আছে। আর এগুলো আছে বলেই আমরা কথা বলতে পারি। আচ্ছা তোমরা কি জানো নিশ্বাস কাকে বলে?

সবাই বলল, জানি, এই যে আমরা যখন শ্বাস নিই আর ছাড়ি এটাকেই তো নিশ্বাস নেওয়া বলে।

না, শ্বাস নেওয়া হলো প্রশ্বাস আর শ্বাস ছাড়া হলো নিশ্বাস। আমরা শ্বাস নিই তখন সেই হাওয়াটা নাক আর মুখ দিয়ে ঢুকে শ্বাসনালি দিয়ে ফুসফুসে জমা হয়। আর যখন নিশ্বাস ছাড়ি, তখন ফুসফুস থেকে হাওয়া শ্বাসনালি দিয়ে এসে মুখ আর নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়। কথা বলার জন্য এই বেরিয়ে আসা শ্বাসটা অর্থাৎ নিশ্বাসবায়ুটা দরকার। এইবার তাহলে বলো প্রথমে কী কী জিনিস লাগে?

রত্না বলল, ফুসফুস আর নিশ্বাস।
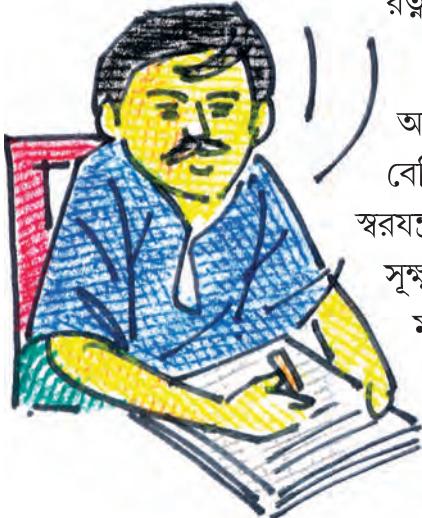
একদম ঠিক। এই নিশ্বাসবায়ু যখন শ্বাসনালি দিয়ে গলায় আসে, সেখানে একটা যন্ত্র আছে, সেই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে হাওয়াটা বেরিয়ে যায়। যন্ত্রটার নাম স্বরযন্ত্র। গলা বলতে বুঝতে হবে এই স্বরযন্ত্রকে। স্বরযন্ত্রটা দেখতে আংটির মতো । এর মধ্যে দুটো খুব সূক্ষ্ম তন্ত্রী আছে। এদের স্বরতন্ত্রী বলে। হাওয়া যখন এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন এই তন্ত্রীদুটি কাঁপতে থাকে। এর ফলে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। ধ্বনি বলতে গলার আওয়াজ।

এইবার রাবেয়ার কথায় আসি। রাবেয়া বলেছিল মুখ। মুখের ভিতরের ছবিটাই এবার শুধু আঁকি :

ছবিতে তিরচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে নিশ্বাস কীভাবে বেরোয়। নিশ্বাস যখন স্বরযন্ত্রের ভিতর দিয়ে এসে মুখের মধ্যে আসে, তখন জিভ তাকে নানারকমভাবে আটকায়। এবার তোমরা জিভ দিয়ে মুখের ভিতরের উপরের থেকে একেবারে পিছনটায় ঠেলা দাও, দেখো তো জায়গাটা নরম না শক্ত?

সবাই বলল, বেশ নরম নরম।

ঐ জায়গাটা হলো মূর্ধা। আর তার সামনেটা কেমন?

এবার সবাই বলল, বেশ শক্ত।

ঐ শক্ত জায়গাটা হলো তালু। তালুর সামনে উপরের দাঁতের সারি। নীচে জিভ, আর জিভের সামনে নীচের দাঁতের সারি। দাঁতের সামনে ওষ্ঠ আর অধর অর্থাৎ উপরের আর নীচের ঠোঁট। তাহলে মুখ হলো এই সব মিলিয়ে। কৌশিক, কৃশানু আর রাবেয়া বলেনি এরকম আরেকটা অঙ্গ কথা বলতে গেলে দরকার হয়। বলো তো কী?

সবাই একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে দেখে আমিই বললাম, নাক। একটু অবাক হলো সবাই।

হাওয়াটা যখন বেরোয়, সে তো শুধু মুখ দিয়ে নয়, নাক দিয়েও বেরোয়। যখন নাক দিয়ে বেরোয় তখন নাকের ভিতরের দেয়ালে ঘসা লাগে। এর ফলে কথায় নাকি সুর লাগে। যখন আমরা চাঁদ বলি বা মামা বলি বা নয়ন বলি তখন এই রকমটা ঘটে। ইংরেজি ক্লাসে সবাই জেনেছ যে 'টাং' (Tongue) কথাটার মানে 'জিভ'। তাহলে একটা প্রশ্ন করি যে টাং-এর মানে যদি জিভ হয়, তাহলে 'মাদার টাং' মানে তো 'মায়ের জিভ' হওয়ার কথা, কিন্তু তা তো আমরা বলি না; আমরা বলি 'মাতৃভাষা'। কেন এরকম বাংলা করি আমরা? জিভের সঙ্গে ভাষার কি কোনো সম্পর্ক আছে? আছেই তো। তোমরা শুধু 'টাং' শব্দটা খেয়াল করেছ। কিন্তু আরেকটা শব্দ আছে ইংরেজিতে, 'ল্যাংগুয়েজ', যার বাংলা অর্থ হলো ভাষা। সেই 'ল্যাংগুয়েজ' শব্দটির মধ্যেও আছে জিভের কথা। ল্যাটিন ভাষায় 'লিঙ্গুয়া' শব্দের অর্থ জিভ, সেই 'লিঙ্গুয়া' শব্দ থেকেই তো এসেছে ল্যাংগুয়েজ শব্দটা। আসলে কথা বলার সময় সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করে জিভ। সে মুখের মধ্যে নানাদিকে দৌড়ে বেড়ায়। তার সঙ্গে সঙ্গত করে ঠোঁট। এই জিভ মুখের মধ্যে নানা জায়গা ছুঁয়ে আর ঠোঁট দুটো একে অপরকে স্পর্শ করে আমরা এতরকম আওয়াজ করতে পারি। এইবার তাহলে গোড়া থেকে পর পর বলো যে, কথা বলতে কী কী লাগে?

সবাই নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মেতে উঠল। বার বার দেখতে লাগল বোর্ডের ছবি দুটো। বেরোল কাগজ-কলম। একটু লেখালিখিও হলো।

তারপর উঠে দাঁড়াল কৃশানু। বুঝলাম সবাই আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে এসেছে। আর কৃশানুর উপর ভার পড়েছে ব্যাপারটা বলার।

কৃশানু বলল, প্রথমে দরকার হাওয়া যে হাওয়া ফুসফুস থেকে বেরোচ্ছে। তাহলে দ্বিতীয় দরকার ফুসফুসের। সেই হাওয়া শ্বাসনালি দিয়ে গেল। শ্বাসনালি হলো তৃতীয় দরকারি জিনিস। তারপর দরকার স্বরযন্ত্র। স্বরযন্ত্রের পর মুখের ভিতর জিভ আর উপরে ছাদের মতো মূর্ধা আর তালু । তারপর দাঁত আর শেষে ঠোঁট । এর সঙ্গে লাগে নাক।

এত সুন্দর গুছিয়ে বলল কৃশানু যে আমার কথা বলার সব দরকারি অঙ্গ থাকা সত্ত্বেও কোনো কথা বলতে পারলাম না। শুধু তো কৃশানু নয়, সবাই ওকে সাহায্য করেছে বলেই না ও এত ভালো বলল!

মনে মনে বললাম ,তোমাদের কথা যেন কোনোদিন বন্ধ না হয়! ক্লাসের বাইরেটা তখন সকালের রোদে ঝলমল করছে...

স্বরধ্বনি

আজ ক্লাসে দেখি সবাই নিজেদের মধ্যে কী একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে। আমাকে দেখেই সবাই শুরু করল কথা বলতে। আমি বললাম, এক-এক করে গুছিয়ে বলো, কী বলতে চাও?

সুমিতা বলল, আপনি আগের ক্লাসে বলেছিলেন যে জিভ সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করে। কিন্তু আগের বছরে আমরা দেখেছি যে ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রেই জিভ নিশ্বাসবায়ুকে আটকে দেয়। তাই নানা রকম ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হয়। স্বরধ্বনির বেলায় তো জিভ তেমন কিছু করে না। তাহলে জিভ এত গুরুত্ব পায় কেন?

বুঝলাম যে গত বছরে যখন স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনি নিয়ে গল্প করেছিলাম, তখন স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে জিভের কথাটা বাদ গিয়েছিল।

দেখো, ব্যঞ্জনধ্বনির সময় জিভের দৌড়োদৌড়িটা আমরা বুঝতে পারি। স্বরধ্বনির সময়েও জিভ অনেক কাজ করে, ঠোঁটও করে কিন্তু আমরা টের পাই না, মুখের মধ্যে জিভ নড়াচড়া করলেও কোনো জায়গা যেহেতু ছুঁয়ে দেয় না, তাই আমরা ভাবি যে স্বরধ্বনির সঙ্গে জিভের তেমন কোনো যোগ নেই।

আমার কথা শুনে সবাই দেখলাম নিঃশব্দে স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে লেগেছে। আর তারপরেই এক-একজন যেন আবিষ্কার করার মতো উত্তেজনায় এক-একটা ধ্বনি নিয়ে বলতে শুরু করল।

স্বপন বলল, অ-বলার সময় ঠোঁটটা যতটা গোল থাকে, আ-বলার সময় ততটা থাকে না।

স্বপনের কথা শেষ হতে না হতেই কল্যাণ বলল অ-এর চেয়েও ও-বলার সময় গোলটা আরো ভালো হয় আর গোলটা ছোটো হয়ে যায়। কিন্তু ই বা এ বা অ্যা বলার সময় উল্টো হয়। ঠোঁটটা কেমন যেন ছড়িয়ে যায়।

সে তো উ-বলার সময়ে ঠোঁট আরো সরু হয়ে যায় আর কুঁচকেও যায়, তৌফিক যেন ঠোঁটের ব্যাপারে খুব উৎসাহী নয়।

ঠোঁট তো বোঝা গেল, কিন্তু জিভ?

আবার শুরু হলো নিঃশব্দে উচ্চারণ। কিন্তু আবিষ্কারের আনন্দ মুখগুলোয় আর দেখা গেল না। যেন জিভ ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হচ্ছে না ওদের কাছে। আমিই একটু সাহায্য করলাম : তোমরা প্রথমে শুধু ও আর ই-র কথা ভাবো।

এই কথায় কিন্তু কাজ হলো। ও-বলার সময় জিভটা যে একটু গুটিয়ে থাকে আর ই-বলার সময় জিভটা যে এগিয়ে আসে, এ কথা সবাই বলল।

আর জিভের সামনেটা কী অবস্থায় থাকে, তোমরা কি খেয়াল করলে? ও-বলার সময় জিভের সামনেটা একটু উঠে থাকে আর ই-বলার সময় একটু নীচের দিকে নেমে যায়, তাই না?

এইবার মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে পুরো ব্যাপারটা লিখে দিলাম।
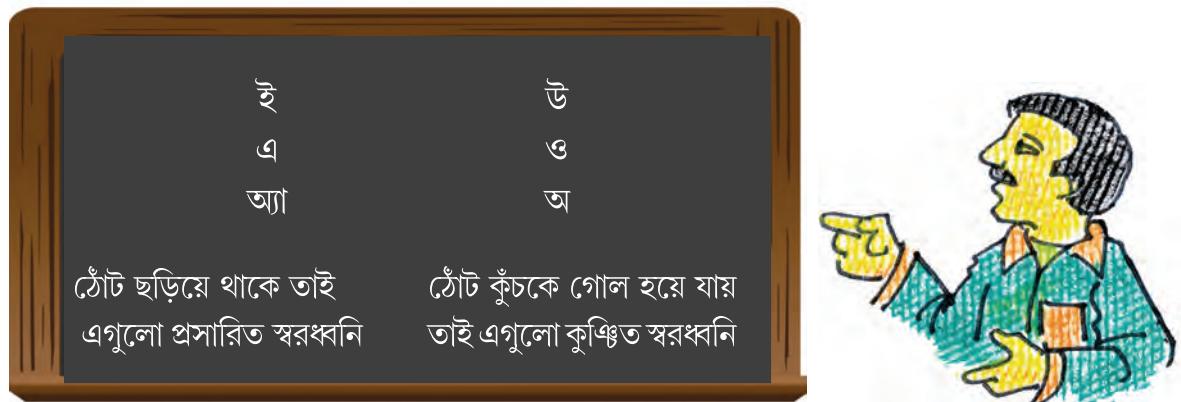
প্রথমে দেখালাম ঠোঁট কীরকমভাবে এক-একটা স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময় বদলে যায় :
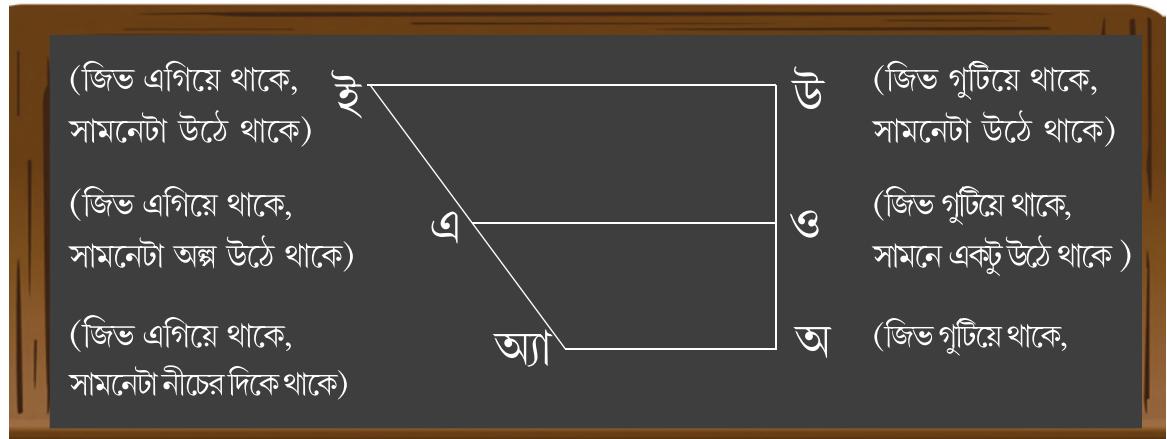
তারপর দেখালাম জিভ কীভাবে প্রত্যেকটি স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে নড়াচড়া করে :

এইবার প্রত্যেকে জোরে জোরে প্রত্যেকটা স্বরধ্বনি উচ্চারণ করল এবং সবাই লক্ষ করল জিভ আর ঠোঁটের অবস্থান। কিন্তু এই দুটি ছকে কোথাও 'আ' -কে খুঁজে পেল না। আ-এর কী হলো?

এই যে সব ক্ষেত্রে দুই পক্ষ, আ-কোনো পক্ষেই থাকে না। আ-বলতে ঠোঁট কুঁচকে যায় না যেমন, তেমনি ই-এর মতো প্রসারিতও হয় না। জিভও পুরোপুরি গুটিয়ে যায় না বা এগিয়ে যায় না, জিভের সামনেটা উঠেও থাকে না, নেমেও থাকে না। সব দিক থেকে একটা মাঝামাঝি জায়গায় থাকে। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে অবশ্য 'আ' ভীষণভাবে এক পক্ষ নেয়।

আ-এর রহস্য সমাধান করার আগে তোমাদের আরেকটা জিনিস দেখাই। এই যে ঠোঁট বা জিভ নড়াচড়া করছে, এর ফলে মুখের মধ্যে আরেকটা ঘটনাও ঘটছে। মুখের মধ্যের জায়গাটা কখনও বেড়ে যাচ্ছে। কখনও কমে যাচ্ছে। ই-বলার সময়ে মুখের মধ্যের জায়গা একেবারে কমে যাচ্ছে আর অ-বললে সেই জায়গাটাই বেড়ে যাচ্ছে।

এ কথা বলামাত্রই কৃশানু আমায় চমকে দিয়ে বলে উঠল, অ-কেন বরং আ-র বেলাতেই তো জায়গাটা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে।

একদম ঠিক। এদিক থেকে দেখলে 'আ' ভীষণভাবে এই পক্ষ নেয়। অর্থাৎ কিছু স্বরধ্বনি আছে, সেগুলি বলতে গেলে মুখের মধ্যে বেশ খানিকটা জায়গা তৈরি হয়। যেমন আ, অ, অ্যা এদের ভালো নাম বিবৃত স্বরধ্বনি। আর ই, এ, উ, ও এদের ক্ষেত্রে মুখের ভিতরের জায়গা কমে যায়। এদের বলে সংবৃত স্বরধ্বনি।

সামনের বেঞ্চে রত্না মন দিয়েই শুনছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ হলো একটু যেন উসখুশ করছে। কী যেন একটা বলতে চায়। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি কিছু বলবে?

রত্না একটু ইতস্তত করে বললে, এগুলো জেনে লাভ কী? কথা বলার সময় তো আমরা এ সব ভেবে কথা বলি না। তাহলে?

আমি প্রথমেই বলেছিলাম, জিভের পরিশ্রমটাই সব চেয়ে বেশি। স্বরধ্বনি হোক বা ব্যঞ্জনধ্বনি, জিভের থামার কোনো সময় নেই। এত পরিশ্রম করতে হয় বলে জিভ মাঝে মাঝে কৌশল করে পরিশ্রম কমিয়ে নেয়। শর্টকাট রাস্তা ধরে। তার ফলে, ধ্বনির চেহারা একটু হলেও পাল্টে যায়। এই শর্টকাট ব্যাপারটা বোঝার জন্যই এগুলো জানা দরকার। পরে বলব কেমন করে জিভ এই পরিশ্রম কমায়, শর্টকাট করে।
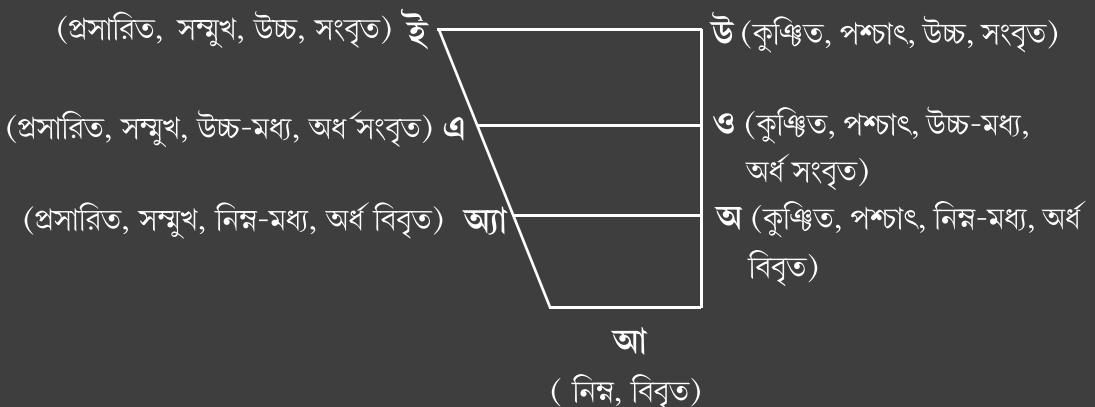
হাতে কলমে

১. **বাঁ-দিকের সঙ্গে ডানদিক মেলাও:**

বাঁ-দিক	ডানদিক
ই, এ, অ্যা	প্রসারিত
ই, উ	হ্রস্বস্বর
আ, ঈ, ঊ	কুঞ্চিত
ই, এ, অ্যা	সম্মুখ
উ, ও, অ	সংবৃত
অ, ই, উ	দীর্ঘস্বর

২. **নীচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল লেখো:**

২.১ ও-ধ্বনি কুঞ্চিত, সম্মুখ, উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি।

২.২ এ-র ক্ষেত্রে জিভ গুটিয়ে থাকে, সামনেটা অল্প উঠে থাকে।

২.৩ উ, ও, অ সবকটি কুঞ্চিত স্বরধ্বনি।

২.৪ এ, অ দুটিই অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি।

ব্যঞ্জনধ্বনি

সেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হলো। সবারই চোখ জানলার বাইরের দিকে। এমন দিনে কাদা-ভরা মাঠে ফুটবল খেলার আনন্দই আলাদা। তবে সকালে সেটা সম্ভব নয়। তাই ক্লাসঘরে শুরু হলো ফুটবল খেলার গল্প, আর পৃথিবীর সেরা ফুটবলারদের কথা। দিয়েগো মারাদোনা কোন দেশের খেলোয়াড়? পেলে-র দেশ কোনটা? মেসি-র জন্মই বা কোন দেশে?

এভাবেই গল্প চলছিল।

আমি বললাম, ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর নিজস্ব দেশ আছে, নিজস্ব জন্মভূমি আছে।

বৃষ্টির দিনে ফুটবল খেলার গল্পের মধ্যে হঠাৎই ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যাপারটা মনে না ধরলেও, আমার কথাটা একটু চমকে দিল কৌশিক, কৃশানুদের।

যে যেখানে জন্মায় সেটাই তো তার দেশ। তাহলে তোমরা ভাবো কে কোথায় জন্মায়, কীভাবে আমরা বলি? তোমরা ক-ধ্বনি উচ্চারণ করো আর খেয়াল করো উচ্চারণ করার সময়ে মুখের ভিতরে কী ঘটছে?

রত্না বলল, জিভের ভিতরের দিকটা উঠে গিয়ে গলার কাছটা ছুঁয়ে দেয়। আর ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক-ধ্বনিটা তৈরি হয়।

বেশ! তাহলে ক-এর জন্মভূমি বা দেশ হলো কণ্ঠ। এবার দেখো খ, গ, ঘ, ঙ কীভাবে বলি আমরা। সবাই বলল যে খ, গ, ঘ ক-এর মতোই। কিন্তু ঙ টা বুঝতে পারছি না।

বেশ, বলো 'রাঙিয়ে' কথাটা। আর খেয়াল করো ঙ-টা কীভাবে বলছ?
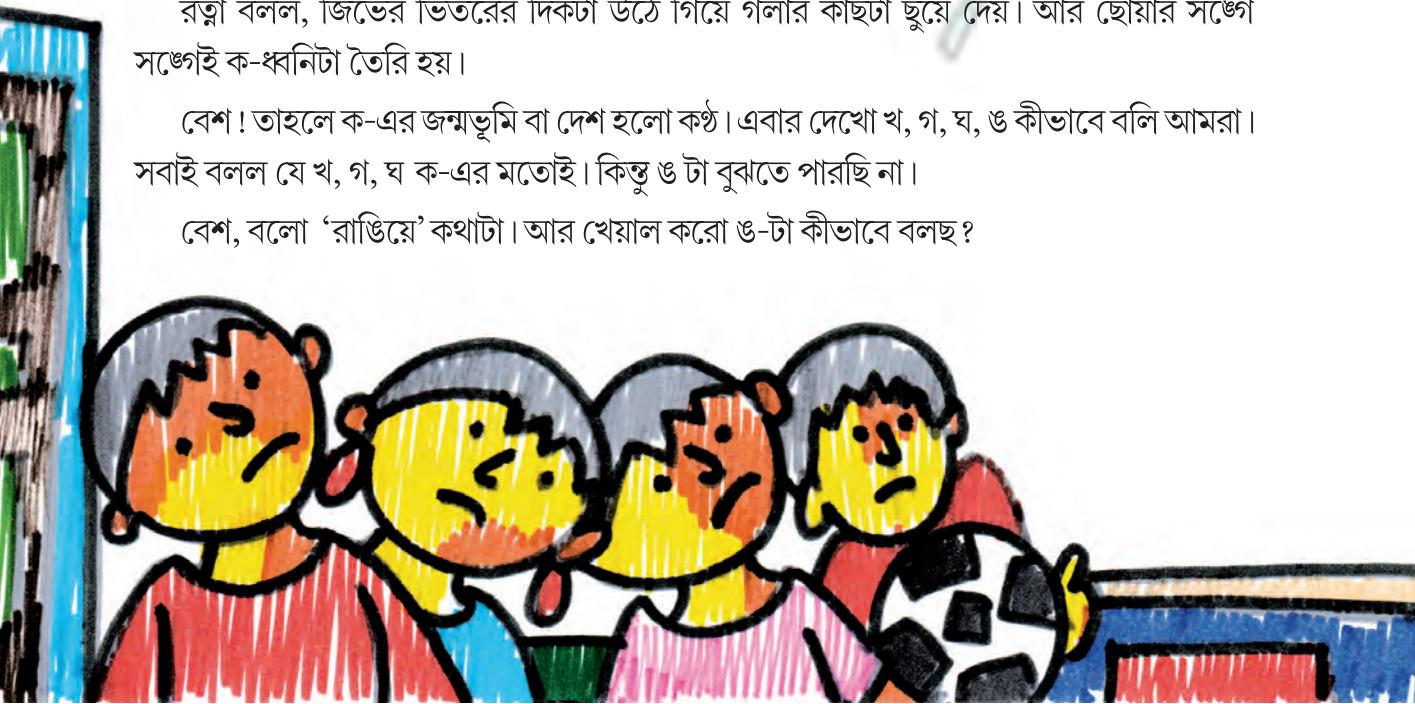
এবার সবাই বলল যে ঙ-টা ক, খ, গ, ঘ -এর মতোই।

তাহলে বুঝতে পারলে ক, খ, গ, ঘ, ঙ -এই পাঁচটা ধ্বনিরই জন্মস্থান কণ্ঠ। তাই এদের কণ্ঠ্যধ্বনি বলে, তার এই পাঁচটাকে একসঙ্গে আবার ক-বর্গও বলে। এবার বলো চ-এর দেশ কোনটা?

ফুটবল খেলার কথা ভুলে নতুন খেলায় সবাই যোগ দিল। কিন্তু চ-এর বেলায় দেশের নামটা কেউ দেখি বলতে পারছে না।

জিভের একটু ভেতরের দিকটা উপরে উঠে ছুঁয়ে আছে, সেই জায়গায় নাম কী হবে?

আবার মুখের ভিতরের ছবিটা ব্ল্যাকবোর্ডে এঁকে দিলাম।

এইবার বলো চ-এর দেশ কোনটা?

খুব সহজেই সবাই বলল, তালু।

এই দেশ আর কার কার?

ছ, জ, ঝ, ঞ। চ কে নিয়ে এই যে পাঁচজন, এরা হলো তালব্য ধ্বনি। এদেরকে একসঙ্গে আবার চ-বর্গ বলে।
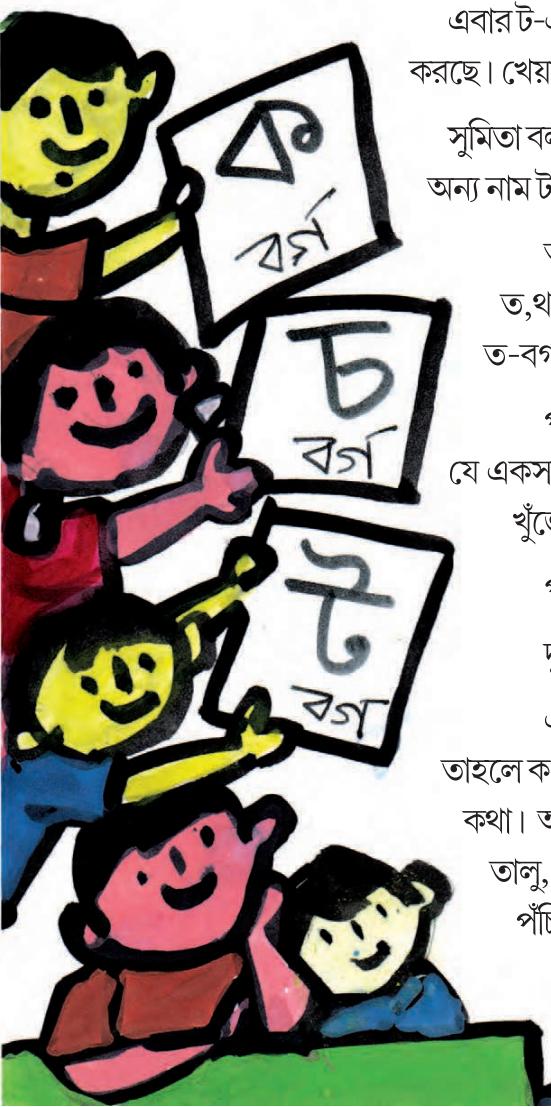
এবার ট-এর পালা। তবে দেশ ব্যাপারটা এখন বুঝে গেছে ওরা। মুখে উচ্চারণ করছে। খেয়াল করছে জিভের কোনখানটা কোথায় ঠেকছে।

সুমিতা বলল, ট-এর দেশ মূর্ধা। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ এই পাঁচজন হলো মূর্ধন্যধ্বনি। অন্য নাম ট- বর্গ।

আমাকে এর পরে প্রশ্ন করতেই হলো না। নিজেরাই বলে দিল যে, ত,থ, দ, ধ, ন- এর দেশ দন্ত। এরা সবাই দন্ত্যধ্বনি। আর সবাই মিলে ত-বর্গ।

প-বর্গের বেলায় সামান্য একটু থমকালো ওরা। প, ফ, ব, ভ, ম যে একসঙ্গে প-বর্গ সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশ কীভাবে খুঁজে পাবে? জিভটা কোথাও স্পর্শ করছে না।

প,ফ,ব,ভ,ম তোমরা বলছ কী করে?

দুটো ঠোঁট দিয়ে। এ ওকে ছুঁলেই তো ধ্বনিগুলো হচ্ছে।

একদম ঠিক। তাহলে এই দেশের নাম ওষ্ঠ আর এরা সব ওষ্ঠ্যধ্বনি। তাহলে ক থেকে ম পর্যন্ত এই পঁচিশটি ধ্বনি থেকে আমরা পেলাম পাঁচটা দেশের কথা। আসলে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করার সময় জিভ মুখের ভিতরে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, আর দুটি ঠোঁট পরস্পরকে ছোঁয় বা স্পর্শ করে বলে এই পঁচিশটি ধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বলে।

এরপর কৃশানু যে প্রশ্নটা করল সেটা কিন্তু খুব জটিল। কৃশানু বলল, একই জায়গায় জন্মালে সেই জায়গার সবকটা ধ্বনি এক হতো। ধরা যাক কণ্ঠ্যধ্বনির কথা। সবকটাই তো একইরকম হতো। কিন্তু তা তো হলো না। কেন হলো না?

আসলে ধ্বনির ক্ষেত্রে জন্মস্থানটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। আরো কিছু ব্যাপার আছে। আগেই জেনেছ, যে-শ্বাসবায়ু আমরা ছেড়ে দিই (অর্থাৎ নিশ্বাস বায়ু), সেই শ্বাসবায়ু গলার এমন একটা অংশের মধ্যে দিয়ে আসে তার ফলে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই অংশটির নাম স্বরযন্ত্র। এই যন্ত্রের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম দুটো তন্ত্রী থাকে। এই তন্ত্রীর মধ্যে বায়ু বেরোলে তন্ত্রী দুটি কাঁপতে থাকে এবং ধ্বনির সৃষ্টি হয়। তাহলে বুঝতে পারছ যে আরো দুটি জিনিস দরকার হয় ঠিকঠাক ধ্বনির জন্মের জন্য। এখন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই শ্বাসবায়ু বেশি লাগে, কখনো কম। আবার কখনো এই তন্ত্রীদুটি কাঁপার ফলে কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়, আবার কখনো হয় না। এই সব কারণে জন্মস্থান এক হলেও ধ্বনিগুলো একটু একটু করে আলাদা হয়ে যায়।

যেমন ধরো, ক-বর্গের ক্ষেত্রে ক আর খ উচ্চারণ করতে গেলে জন্মস্থান একই থাকে, কিন্তু ক-এর বেলায় শ্বাসবায়ু কম লাগে, খ-এর বেলা বেশি লাগে। তাই ক হলো অল্পপ্রাণ আর খ হলো মহাপ্রাণ ধ্বনি।

এরকম নাম হলো কেন? কৌশিকের প্রশ্ন। সত্যিই তো কেন এরকম নাম, ক্লাসের সবাই কৌশিকের প্রশ্নকে সমর্থন করল।

তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে আমরা সবসময়ই শ্বাস নিই, শ্বাস ছাড়ি। এর কোনো বিরাম নেই। যদি আমরা জোর করে করে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে দিই, তাহলে দেখব শরীরে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন মারা যাব। শ্বাসবায়ু বন্ধ হয়ে অনেকে মারা গেছেনও। তাই শ্বাসবায়ুই যেন প্রাণ। সে কারণে যখন আমরা বলছি যে ক-এর ক্ষেত্রে শ্বাসবায়ু কম লাগে তখন অল্পপ্রাণ ধ্বনি আর খ-এর বেলায় শ্বাসবায়ু বেশি লাগে বলে তা মহাপ্রাণ ধ্বনি। একই ঘটনা ঘটে গ আর ঘ এর বেলাতেও। গ অল্পপ্রাণ আর ঘ মহাপ্রাণ ধ্বনি। একটা কৌশল শিখিয়ে দিই। যেকোনো বর্গের প্রথম আর তৃতীয় ধ্বনি অল্পপ্রাণ আর দ্বিতীয় আর

চতুর্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ হয়। দাঁড়াও, আগে বোর্ডে একটা ছক এঁকে দেখাই :
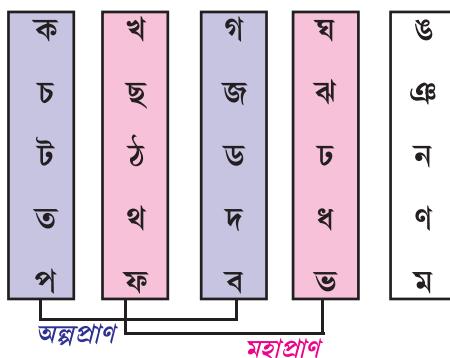
আবার দেখো ক আর গ-এর জন্মস্থানও এক আবার শ্বাসবায়ু লাগছেও সমান। তাহলে ক আর গ কী করে আলাদা হলো? এবার দেখতে হবে গলায় যে যন্ত্রের কথা বলেছিলাম সে কেমন ভাবে কাজ করে।

যন্ত্রের মধ্যের তন্ত্রীদুটি গ-এর বেলায় বেশি কাঁপে, তাই একটু গম্ভীর শুনতে লাগে। ক-এর বেলায় তা হয় না। গ আর ঘ আবার এদিক থেকে একইরকম। ঠিক তেমনি ক আর খ।

এবার একটা অন্য প্রশ্ন, ঘোষ মানে কী?

সবাই বলল, ঘোষ একটা পদবি। ক্লাসে অনেকেরই এই পদবি আছে।

ঘোষ পদবি ঠিকই, কিন্তু একটা শব্দের একাধিক মানেও হয়। যেমন গুণ বলতে তোমরা ভাবো অঙ্কের ব্যাপার। তিনের সঙ্গে দুই গুণ করলে ছয় হয়। আবার তোমরা পড়েছ গুণ টানা হলো একধরনের নৌকো চালানো। ঠিক তেমনি ঘোষ এর আরেকটা মানে সুরের গাম্ভীর্য। গ আর ঘ-এর ক্ষেত্রে সেটা ঘটে তাই এদের বলে ঘোষ আর ক আর খ-এক বেলায় ঘটে না বলে এরা অঘোষ। বর্গের প্রথম দুটি ধ্বনি অঘোষ, পরের দুটি ধ্বনি ঘোষ।

আর ঙ, ঞ, ন, ণ, ম-এদের বেলায় কী হবে? শ্বাসবায়ু যদি নাকের পথ দিয়ে বেরোয়, তখন নাকের মধ্যের দেয়ালে ঘসা লেগে বিশেষ একটা আওয়াজ তৈরি হয়। আমরা চলতি কথায় নাকি সুর বলি। ভালো করে বললে বলতে হয় যে এদেরকে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

তাহলে ক থেকে ম পর্যন্ত ধ্বনিগুলিকে একনজরে দেখে নেওয়া যাক :

বর্গ	উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		নাসিক্য
		অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	
ক-বর্গ	কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ-বর্গ	তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট-বর্গ	মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত-বর্গ	দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
প-বর্গ	ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

যদি বলি তোমাদের, বলো তো জ-ধ্বনি কেমন? এই ছক থেকেই সবটা বলা হয়ে যাবে। জ-ধ্বনি হলো চ-বর্গের মধ্যে, দেশ বা উচ্চারণস্থান তালু, অল্পপ্রাণ এবং ঘোষ।

রাবেয়ার মনের মধ্যে মনে হলো একটা লড়াই চলছে। কোনো বিষয়ে তার মধ্যে একটা খটকা লেগেছে। নিঃশব্দে সে ধ্বনি উচ্চারণ করছে আর কুঁচকে যাচ্ছে ভুরুদুটো।

আমি বললাম, কিছু বলবে রাবেয়া?

আমি যে ওকে খেয়াল করেছি, তা বুঝতে পেরে একটু লজ্জা পেল। তারপর বলল, আপনি বলেছেন ক থেকে ম স্পর্শবর্ণ। কারণ জিভ মুখের ভিতর কোথাও না কোথাও স্পর্শ করে এই ধ্বনিগুলোর জন্ম দেয়। কিন্তু বাকি যে ব্যঞ্জনধ্বনি, সেখানে কি জিভ কোথাও স্পর্শ করে না?

একথার উত্তর নিজেরাই খুঁজে পাবে। ম-এর পর আর কী কী ব্যঞ্জনবর্ণ আছে?

সবাই সমস্বরে বলল, য র ল ব শ ষ স হ ং ঃ বেশ। প্রথমে য র ল ব—এই চারটি ধ্বনির কথা ভাবো। জ আর য-এর তফাত কী? তোমাদের কান কী বলে?

আমরা তো তেমন কোনো ফারাক বুঝতে পারি না।

তোমরা কি কেউ ইংরেজি বা হিন্দি ভাষায় খবর শোনো? দুটি হাত উঠল। বলল, খবর শোনে না কিন্তু খেলার ধারাভাষ্য শোনে।

আমি বললাম, সেখানে কি লক্ষ করেছ যাদের নামের মধ্যে য আছে, সেই নামের উচ্চারণ কী হয়?

দুজনের একজন বলল, যাদব শব্দটাকে ইয়াদব বলতে শুনি। ইংরেজি লেখেও তো Ya দিয়ে।

তার মানে জ আর য-এর উচ্চারণ বাংলায় একরকমের হলেও সংস্কৃতে এ রকম ছিল না। এখনও হিন্দি সহ অনেকগুলো ভাষাতে আলাদা উচ্চারণ হয়। বর্গীয় জ যেমন করে বলে, প্রায় তেমন ভাবে জিভ তালুর খুব কাছে গিয়েও স্পর্শ না করলে য-ধ্বনি পাওয়া যায়। স্বরধ্বনির মতো শ্বাসবায়ুকে পুরোপুরি ছেড়ে দেয় না, আবার ব্যঞ্জনধ্বনির স্পর্শধ্বনির মতো সম্পূর্ণ আটকেও দেয় না। এই দু'ধরনের মাঝামাঝি বলে একে বলে অন্তঃস্থ-য। এখানে যে ব আছে, তার উচ্চারণও ঠিক বর্গীয়-ব-এর মতো নয়। অন্তঃস্থ-ব উচ্চারণ করতে গিয়ে ঠোঁট দুটো খুব কাছাকাছি আসবে, কিন্তু স্পর্শ করবে না। অনেকটা 'ওয়া' ধরনের আওয়াজ হবে। এই য আর অন্তঃস্থ-ব যেহেতু না-স্বর, না-ব্যঞ্জন তাই এদের অর্ধস্বরও বলে। বাকি রইল র আর ল। দেখোতো র আর ল উচ্চারণ করার সময়ে কী ঘটে?

রত্না বলল, র আর ল-এর সময়ে জিভ দাঁতের উপর দিকে কেমন যেন আলতো করে ঠেকে। র-এর সময় জিভটা প্রজাপতির পাখার মতো কাঁপেও।

এই তো উত্তর পাওয়া গেল। র-হলো কম্পিত ধ্বনি। আর ল-এর ক্ষেত্রে জিভ দাঁত বা দাঁতের উপরে তালুতে ঠেকে বটে, কিন্তু শ্বাসবায়ু এতে পুরোপুরি বাধা পায় না। জিভের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাই ল-কে আমরা পার্শ্বিক ধ্বনি বলতে পারি। র-এর কথা যখন হলো, তখন ড় আর ঢ়-কথাও বলে দিই। লক্ষ করো জিভ কিছুটা উলটে গিয়ে দাঁতের গোড়া স্পর্শ করেই ঝাঁপিয়ে নেমে আসে। এ জন্য একটা তাড়নের সৃষ্টি হয়। তাই এ দুটিকে তাড়িত ব্যঞ্জন বলা হয়। এই বার দেখো তো শ, ষ, স-এর বেলায় কী ঘটে?

কৃশানু বলল, এগুলোর নামের মধ্যে তো সব বলা আছে। স-এর উচ্চারণ হয় দাঁতে, শ-এর উচ্চারণ তালুতে আর ষ-এর উচ্চারণ মূর্ধায়।

কিন্তু এগুলোর বেলায় খেয়াল করতে হবে শ্বাসবায়ুকে। লক্ষ করো তো এই তিনটে ধ্বনি বলার সময়ে শ্বাসবায়ু বেশি লাগছে না একই রকম লাগছে?

নিজেরাই উচ্চারণ করে বলল যে শ্বাসবায়ু বেশি লাগছে। আমি বললাম শ্বাসবায়ু বেশি লাগছে বলে এদের উষ্মধ্বনি বলে। উষ্ম মানে শ্বাসবায়ু। হ-এর বেলাতেও তাই শ্বাসবায়ু বেশি লাগে, কিন্তু জিভ কোথাও স্পর্শ করে না।

রাবেয়া বলল, জিভ যদি কোথাও স্পর্শ না করে, তাহলে তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয় কেন?

আমি বললাম, এই প্রশ্নটা অনেক দিন হলো পণ্ডিতদের মধ্যেও আলোড়ন ফেলেছে। তোমার মনে এই প্রশ্নটা যে জেগেছে সেটাই বড়ো কথা। সবাই এ নিয়ে ভাবছে, তোমরাও ভাবতে থাকো। বাকি রইল ং ঃ ঁ। তোমরা এটা জানো যে অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে গেলে ব্যঞ্জনধ্বনির পরে স্বরধ্বনি লাগে, যেমন, ক্ + অ = ক। কিন্তু এগুলোর ক্ষেত্রে আগে স্বরধ্বনি লাগে। অনুস্বর কথাটার মধ্যেই এটা বলা আছে। অনু মানে পিছনে। স্বরের পিছনে যা, তাই অনুস্বর। ঃ আর ঁ -এর ক্ষেত্রেও একই। এরা একা একা ব্যবহৃত হতে পারে না বলে আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ বলে। আবার এদের সঙ্গে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি কারো যোগ নেই, কিন্তু যুক্ত হয়ে ধ্বনির নানারকম পরিবর্তন ঘটায় বলে এদের অযোগবাহ বর্ণও বলে। আশা করি রাবেয়া এবার বুঝতে পারছ কেন ক থেকে ম স্পর্শবর্ণ।

বুঝেছি। বাকি বর্ণ উচ্চারণের বেলায় অনেক সময়ে জিভ স্পর্শই করে না, আর যখন করে তখন নিশ্বাসবায়ু সম্পূর্ণ আটকে দেয় না। সত্যিই, অনেকরকম ব্যঞ্জনধ্বনি হয়।

'ব্যঞ্জন' শব্দের আরেকটা মানে হয়, জানো তো? রান্না করা পদ। সেখানেও তো নানা কিছু দিতে হয়, আর তার বর্ণও হয় নানা রকমের। আর আছে জিভ। দুরকম ব্যঞ্জনেই।
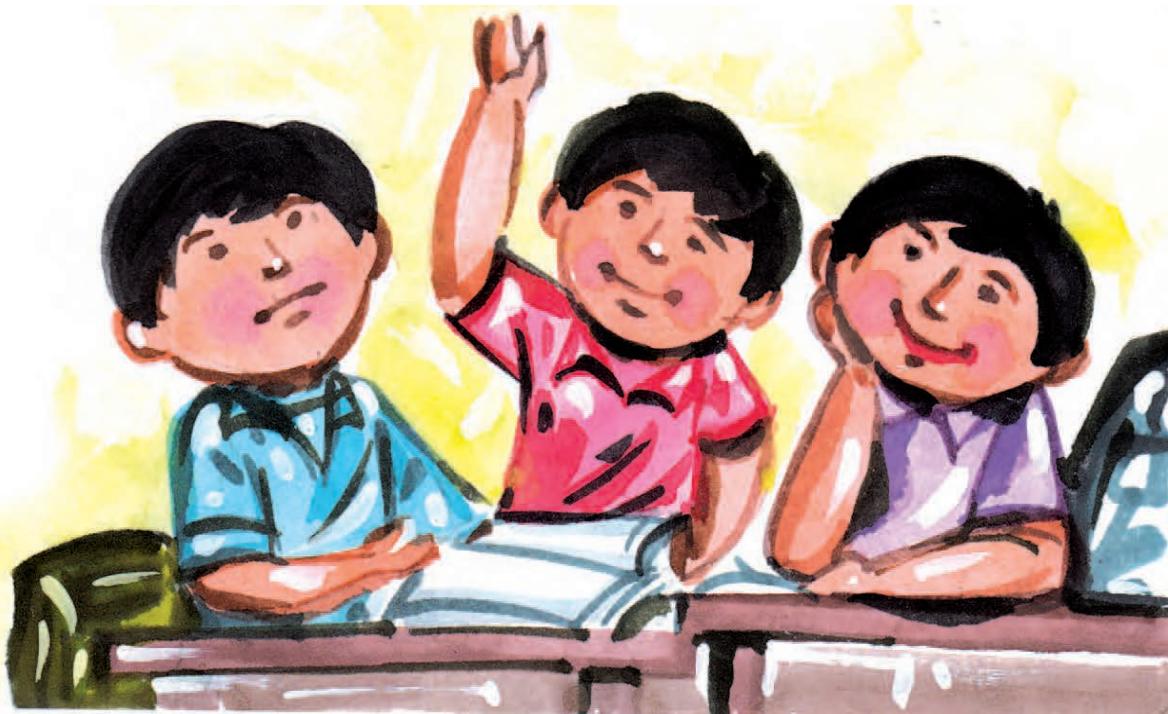
হাতে কলমে

১. বামদিকের সঙ্গে ডানদিক মেলাও:

বামদিক	ডানদিক
ত, থ, দ, ধ	ঘোষ ধ্বনি
ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ	মহাপ্রাণ ধ্বনি
ঙ, ঞ, ণ, ন, ম	অন্তঃস্থ ধ্বনি
ট, ঠ, ড, ঢ	অঘোষ ধ্বনি
প, ফ, ব, ভ	অল্পপ্রাণ ধ্বনি
খ, ঘ, ছ, ঝ	উষ্মধ্বনি
শ, ষ, স, হ	দন্ত্যধ্বনি
গ, ঘ, জ, ঝ, ব, ভ	ওষ্ঠ্যধ্বনি
য, র, ল, ব	মূর্ধন্যধ্বনি
ক, গ, চ, জ, ট, ড	নাসিক্যধ্বনি

২. পাশের স্পর্শধ্বনিগুলি কীরকম লেখো: খ, ধ, ব, থ, ঝ, ণ, প, ম

৩. নীচের উক্তিগুলি ঠিক বা ভুল লেখো:

৩.১ হ একটি উষ্মধ্বনি।

৩.২ ঙ, ঞ নাসিক্যধ্বনি, কিন্তু স্পর্শধ্বনি নয়।

৩.৩ ম নাসিক্যধ্বনি ও ওষ্ঠ্যধ্বনি

৩.৪ য, র, ল, ব — সবকটিই অন্তঃস্থধ্বনি

৩.৫ ং, ঃ — এগুলিকে অর্ধস্বর বলে।

৪. নীচের ছবিটিতে বিভিন্ন ধ্বনির উচ্চারণ স্থানগুলি দেখাও :
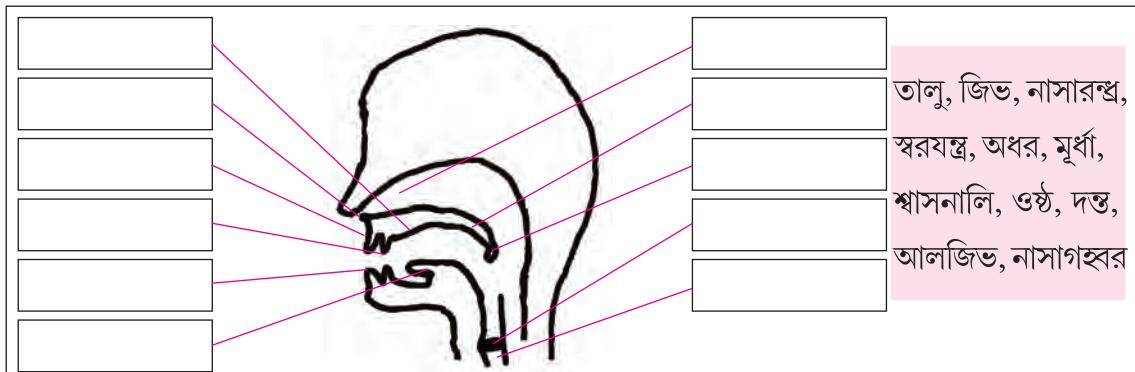
স্বরসন্ধি

দুটো শব্দ, ‘সূর্য’ আর ‘উদয়’ আমরা যখন এই দুটো শব্দ বলি, তখন কেমন করে বলি ?

ক্লাসের সবাই বলল, ‘সূর্যোদয়’ বলি আমরা।

বেশ দেখোতো ‘সূর্যোদয়’ আর ‘সূর্য’ এবং ‘উদয়’ এর মধ্যে কী ফারাক ? বর্ণ বিশ্লেষণ করে আমাকে দেখাও।

কৃশানু বোর্ডে লিখল, সূর্য = স + ঊ + র্ + য্ + অ

উদয় = উ + দ্ + অ + য়্ + অ

এইবার কৌশিক এসে লিখল :

সূর্যোদয় = স্ + ঊ + র্ + য্ + ও + দ্ + অ + য়্ + অ

ক্লাসের সবাই বলল যে সূর্যোদয়ের মধ্যে ‘সূর্য’ শেষের ‘অ’ আর ‘উদয়’-এর ‘উ’ নেই, এ দুটির জায়গায় ‘ও’ এসেছে। অর্থাৎ সূর্য আর উদয় শব্দে যখন জুড়ে গেছে তখন ‘অ’ আর ‘উ’ -র জায়গায় ‘ও’ বসেছে।

স্ + ঊ + র্ + য্ + অ + উ + দ্ + অ + য়্ + অ

স্ + ঊ + র্ + য্ + ও + দ্ + অ + য়্ + অ

কেন এমন হলো ? কী কৌশল করল জিভ ?

‘সূর্য’ বলতে গিয়ে একেবারে শেষের ‘অ’-এর ক্ষেত্রে জিভ ছিল নীচের দিকে আর তারপরেই ‘উদয়’ -এর উ-এর বেলা জিভকে যেতে হচ্ছিল উপর দিকে। একেবারে নীচের থেকে উপরে না গিয়ে জিভ মাঝামাঝি জায়গার ‘ও’ তে পৌঁছাল। কিছুটা পরিশ্রম কম হলো জিভের। যুদ্ধে যেমন দুই পক্ষই কিছু কিছু আপস করে শেষ পর্যন্ত সন্ধি করে, এও যেন তেমনই। নিম্ন স্বরধ্বনি ‘অ’ আর উচ্চ

স্বরধ্বনি 'উ' দুজনেই নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে চলে এল মাঝের জায়গায়। মধ্য স্বরধ্বনি 'ও' এসে যেন যুদ্ধরত দুই পক্ষকে নিরস্ত করল, সন্ধিস্থাপন করল। এইভাবে 'অ' আর 'উ'-এর জুড়ে যাওয়াকেই বলে সন্ধি। আর এই সন্ধি যখন হয় দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে, তখন তাকে বলে স্বরসন্ধি ।

মীনা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলে উঠল, কিন্তু আমরা তো বলার সময় বলি 'সুর্যো'। তাহলে (অ + উ = ও) কেন শিখছি? আমি জানতাম এই প্রশ্নটা আসবেই। কাজেই এবার বুক ঠুকে নামলুম কচিকাঁচাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে। আসলে আমাদের ভাষার একটা বড়ো শব্দভাণ্ডার এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। 'সূর্য' উচ্চারণের সময় শেষে 'অ' ধ্বনিটিই উচ্চারণ হতো। বাংলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য অনেক ভাষাতে এখনও তা-ই হয়। বাংলায় কিন্তু আমরা তা করি না। তোমাদের যে বলেছিলাম জিভের পরিশ্রম কমানো আর শর্টকাটের কথা, বাংলায় তা খুবই বেশি পরিমাণে হয়। 'সূর্য' শব্দটির 'উ'

ধ্বনিটি উচ্চ স্বরধ্বনি, শেষের 'অ' টি নিম্নস্বরধ্বনি। এই দুই ধ্বনির টানাপোড়েনে 'উ' বা 'অ' কেউই অবিকৃত না থেকে মধ্য স্বরধ্বনি 'ও'-র চেহারা নিয়েছে। অপু এতক্ষণ কিছু বলেনি। এবার বলল, আমার নামটাও কি তাই ডাকার সময় 'ওপু' হয়ে যায়? আমি হাসলুম। অভীও লাফিয়ে উঠে বলল, আর আমার নামটাও? আমি বললাম, বটেই তো, অপু-র 'উ' র মতো অভী-র 'ঈ' -ও তো উচ্চস্বরধ্বনি। এই একই কারণে সবাই অভী-কে 'ওভি' বলে ডাকি। এ কথা তো জানোই যে, বাংলায় কোনো স্বরধ্বনিরই দীর্ঘ রূপ উচ্চারণ হয় না। যদি হতো তবে অভীকে ডাকতাম অভি-ই-ই-ই' বলে। সংস্কৃতের বেলায় উচ্চারণ আর তার লেখন একইরকম ছিল। কিন্তু বাংলায় সংস্কৃত ভাষানুসারী বানানবিধি মানা হলেও উচ্চারণ আলাদা বলে ধ্বনি আর বর্ণের মধ্যে মাঝে-মাঝেই অমিল দেখা যায়, আমরা লিখি 'অভী' কিন্তু বলি 'ওভি'। কেন বলি, তা খানিকটা কি তোমাদের বোঝাতে পারলাম? মীনা, কৌশিক, তৌফিক, অভী, অপু— সবাই এবার মাথা নেড়ে সায় দিল।

এইবার কিছু কথা বলা দরকার 'অ' নিয়ে। 'কেন? কেন?' একরাশ প্রশ্ন নিয়ে সবাই আমাকে ঘিরে ধরল। আমি বাবরকে ডাকলাম। হাতে চক দিয়ে বললাম, তোমায় নামটা ইংরেজিতে ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে লেখো। বাবর লিখল, 'BABAR'। আমি বললাম, এবার ওর নীচে বাংলায় লেখো। ও বড়ো করে লিখল, 'বাবর'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা! 'বা' লেখার সময়ে যদি 'BA' লেখা হয় তবে 'ব' লিখতেও কেন 'BA' লিখছ? বাবর মাথা চুলকে বলল, এই রে! ভাবিনি তো কখনো। সন্ধ্যা হঠাৎ

বলে উঠল, আচ্ছা, ‘বা’ লিখতে যদি ‘BAA’ লিখি আর ‘ব’-র বেলা শুধু ‘BA’ বসাই, তাহলে? আমি ওকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, বেশ! তবে তুমিই বোর্ডে এসো। ‘কমল’ আর ‘কামাল’ শব্দদুটো চটপট ইংরেজিতে লিখে ফেলো। সন্ধ্যা লিখল, ‘কমল’ = ‘KAMAL’ আর ‘কামাল’ = ‘KAAMAAL’। আমি বললাম, বেশ। তাহলে দাঁড়াল এই যে ‘A’ মানে ‘অ’ আর ‘AA মানে ‘আ’। অর্থাৎ ‘ই’ যেমন দীর্ঘ হয়ে ‘ঈ’ বা ‘উ’ যেমন দীর্ঘ হয়ে ‘ঊ’-তে পরিণত হয়, ‘অ’-ও তেমনই দীর্ঘ হলে হয় ‘আ’। সংস্কৃত ভাষাতে তো বটেই,ভারতের অন্যান্য অনেক আধুনিক ভাষাতেও তা-ই।

রাহুলের বাড়িতে সবাই হিন্দি ভাষায় কথা বলে। ওকে মাথা নাড়াতে দেখলাম। আমি আবার বলতে শুরু করলাম— বাংলায় কিন্তু তা নয়। বাংলায় আমরা যেভাবে ‘অ’ উচ্চারণ করি ইংরেজিতে সেই ধ্বনিটি লিখলে দাঁড়াবে ‘AW’। তা কখনোই ‘আ’-এর হ্রস্বরূপ নয়। একটি সম্পূর্ণ আলাদা ধ্বনি। আর এই ধ্বনিটি বাংলা ছাড়া অন্য ভারতীয় ভাষাতে নেই বললেই চলে। তৌফিক বলল, তাহলে আমরা যা উচ্চারণ করি আর যা লিখি, তা মাঝে মধ্যেই মিলবে না? ‘হ্যাঁ’, আমি বললাম, বিশেষ করে সন্ধির ক্ষেত্রে এমনটা প্রায়ই হতে দেখবে। যেমন ধরো, (রবি+ ইন্দ্র = রবীন্দ্র)। এক্ষেত্রে সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারে ‘রবি’র শেষে থাকা ‘ই’ আর ‘ইন্দ্র’-র প্রথমে থাকা ‘ই’ যুক্ত হয়ে ‘ঈ’ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলায় তো দীর্ঘস্বর নেই। আমরা উচ্চারণ করি কেবল হ্রস্বস্বরগুলিকেই। তাই (হ্রস্বস্বর + হ্রস্বস্বর = দীর্ঘস্বর)—এই নিয়ম আমাদের উচ্চারণে বোঝা যাবে না। এখন দেখা যাক স্বরসন্ধির ক্ষেত্রে কী কী নিয়ম আবিষ্কার করা যেতে পারে।

সংস্কৃত স্বরসন্ধি:

আমি বললাম, আচ্ছা! বলো তো, ‘সর্ব’ আর ‘অঙ্গ’— শব্দদুটি একবারে এক নিশ্বাসে পরপর উচ্চারণ করলে কেমন শোনাবে? প্রায় গোটা ক্লাস চিৎকার করে বলল, ‘সর্বাঙ্গ’। বা, বেশ! আমি ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে পরপর লিখলাম,

স্ব + অধীনতা = ————————	পদ + অর্পণ = ————————

এবার এক-এক করে ডাকলাম ছেলেমেয়েদের। বললাম, সন্ধিযুক্ত হলে কী হবে লেখো।

অ্যালেক্স লিখল,	স্ব + অধীনতা	=	স্বাধীনতা
সন্ধ্যা লিখল,	পদ + অর্পণ	=	পদার্পণ

আমি প্রশংসা করতে বাধ্য হলাম। দুজনেই একদম ঠিক লিখেছে। তারপর বাকি ক্লাসের দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা বর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখো তো, এসব উদাহরণে কোনো সাধারণ নিয়ম প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই কাজ করছে কিনা? সকলেই খাতা-পেন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

রত্না প্রথম হাত তুলে বলল, সব যোগ চিহ্নের আগে আর পরে 'অ' পাচ্ছি। আমি হাসলাম, ঠিক কথা। আর কিছু?

কৌশিক বলল, হ্যাঁ, সমান সমান চিহ্নের পরে যে শব্দগুলো আছে সেগুলোয় ওই 'অ' দুটোর জায়গায় 'আ' পাচ্ছি।

আমি ভারি খুশি হয়ে বললাম, বেশ, বেশ! তাহলে দ্যাখো, সন্ধির একটা নিয়ম তোমরা নিজেরাই আবিষ্কার করে ফেলেছ। ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে বড়ো করে লিখলাম, **অ + অ = আ**

সবাই বেশ খুশি। শুধু শুভজিতের কপাল দেখি কুঁকড়ে রয়েছে। আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, কী হয়েছে?

শুভজিৎ বলল, 'পদ + অর্পণ'-এর সময় বলছি কিন্তু 'পদ্'। তাহলে [(অ + অ) = আ] কীভাবে হলো? আমি শুভজিতের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললাম, খুব ভালো প্রশ্ন। কিন্তু এর উত্তর আমি আগে তোমাদের দিয়েছি। সংস্কৃতে কোনো পদের শেষে অ-কারান্ত ধ্বনি থাকলে শেষের 'অ'-টি সবসময়েই উচ্চারিত হতো (পদ = প্ + অ + দ্ + অ) বাংলায় যেমন লিখি 'পদ', কিন্তু বলি 'পদ্'— সংস্কৃতে কিন্তু তা হতো না। বাংলার বেশিরভাগ অ-কারান্ত শব্দই এইভাবে 'হসন্ত' দিয়ে শেষ হয়। এইরকম 'হসন্ত'-ওয়ালা ধ্বনিকে বলা হয় 'হলন্ত ধ্বনি'। জীবনের বাড়ি কটকে। বাবার বদলির চাকরি বলে গত দুবছর ধরে এখানে পড়াশুনো করছে। ও মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, কটকে আমাকে সবাই 'জীবনঅ' বলে ডাকে। এখানে ডাকে 'জীবন্' বলে। 'ঠিক কথা।' আমি বললাম।

আমি এবার বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

অশ্ব + আরোহী	=	————
মেঘ + আচ্ছন্ন	=	————

এবার এল তৌফিক আর মীনা।

তৌফিক লিখল, মীনা লিখল,

অশ্ব + আরোহী	=	অশ্বারোহী
মেঘ + আচ্ছন্ন	=	মেঘাচ্ছন্ন

আমি খুশি হয়ে দেখলাম দুজনেই ঠিক লিখেছে। বললাম, এখান থেকে কী সূত্র আবিষ্কার করতে পারলে? অভী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, প্রথম শব্দের শেষে 'অ' আর দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে 'আ' থাকলে তারা মিলে গিয়ে 'আ' হয়ে যায়।

একদম ঠিক। বোর্ডে গিয়ে লিখলাম, **অ + আ = আ**

সন্ধ্যায় দিকে তাকিয়ে বললাম, যদিও 'অশ্ব' আর 'শুভ'-র উচ্চারণ বাংলায় অ-কারান্ত নয়, 'পদ' আর 'মেঘ'-ও হলন্ত শব্দ, সংস্কৃতে এদের উচ্চারণ কিন্তু অ-কারান্ত-ই ছিল। সন্ধ্যা হেসে সায় দিল।

এইবার বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

বিদ্যা + অভ্যাস = ——————

যথা + অর্থ = ——————

আমি কিছু বলবার আগেই অপু দেখি হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি হেসে বললাম, কী হয়েছে?

অপু বলল, বুঝতে পেরেছি। আপনি এবার দেখাচ্ছেন, আগে 'আ' আর পরে 'অ' থাকলে তারাও মিলে গিয়ে 'আ' হয়ে যায়। **আ + অ = আ**

অপু লিখল,

বিদ্যা + অভ্যাস = বিদ্যাভ্যাস

যথা + অর্থ = যথার্থ

আমি হেসে বললাম, আর যদি (আ + আ) হয়?

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'আ' হবে। 'আ' হবে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

চার-পাঁচটা হাত একসঙ্গে উঠল। আমি ফারুকের দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি বলো। ফারুক বলল, এর আগে দেখলাম দুটো 'অ' পাশাপাশি থাকলে তারাও 'আ' হয়ে যাচ্ছে। তাহলে দুটো দীর্ঘস্বর 'আ' পাশাপাশি থাকলে তারাও নিশ্চয়ই 'আ'-ই থাকবে। আ-এর চেয়ে দীর্ঘস্বর হয় না।

আমি ওর পিঠে চাপড়ে দিয়ে বললাম, যাও, বোর্ডে লেখো ... ।

ফারুক লিখল,

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়

মহা + আকাশ = মহাকাশ

ফারুককে বললাম, এবার তাহলে সূত্রটাও লিখে ফ্যালো।

ফারুক বড়ো বড়ো করে লিখল, **আ + আ = আ**

আমি এবার বোর্ডের কাছে গিয়ে বললাম, তাহলে 'অ' আর 'আ'-সংক্রান্ত সন্ধির নিয়মগুলি সব-ই আমরা জেনে ফেলেছি। এবার সেগুলো একসঙ্গে লিখে ফেলা যাক।

সূত্র ১. অ + অ = আ, অ + আ = আ

আ + অ = আ, আ + আ = আ

'এইবার আসা যাক 'ই' আর 'ঈ' ধ্বনির প্রসঙ্গে।' আমি বললাম।

সন্ধ্যা বলল, কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন বাংলায় দীর্ঘস্বর নেই?

ঠিকই বলেছিলাম। ধ্বনি নেই, কিন্তু বর্ণ আছে। ঈ-কার আছে। বানানে তা-ই ব্যবহার হয়। আর আবারও বলছি, এখানে কিন্তু আসলে আমরা শিখছি সংস্কৃত স্বরসন্ধির নিয়ম। খাঁটি বাংলা সন্ধির কথা আসবে এর পরে। বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারের খুব বড়ো একটা অংশ জুড়ে রয়েছে সংস্কৃত থেকে আসা শব্দ। তাদের উচ্চারণ অনেক সময়ে বদলে গেলেও পুরনো বানানই কিন্তু এখনও চালু রয়েছে। আমি বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

রবি	+	ইন্দ্র	=	________
অতি	+	ইত	=	________

অভিষেক বলল, প্রথমটা 'রবীন্দ্র' হবে। আর দ্বিতীয়টা ... দ্বিতীয়টা বোধ হয় 'অতীত' হবে, না?

আমি হেসে বললাম, ঠিক। **ই + ই = ঈ**

অর্থাৎ এখানে দুটো হ্রস্বস্বর 'ই' মিলে হয়ে যাচ্ছে দীর্ঘস্বর 'ঈ'।

সূত্র ২. **ই + ই = ঈ , ই + ঈ = ঈ , ঈ + ই = ঈ , ঈ + ঈ = ঈ**

ছেলেমেয়েরা নানা শব্দ নিয়ে সন্ধির খেলায় মেতে উঠল। বললাম, বেশ, আমি আর কোনো কথা বলব না। শুধু হ্রস্ব আর দীর্ঘ-র ব্যাপারটা মনে রেখে তোমরাই চেষ্টা করবে। দেখি তোমরা পারো কিনা। এবার আসা যাক 'উ' আর 'ঊ'-র নিয়মে।

বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

মরু	+	উদ্যান	=	________
লঘু	+	ঊর্মি	=	________
বধূ	+	উক্তি	=	________
ভূ	+	ঊর্ধ্ব	=	________

শংকর বলল, মরু + উদ্যান = মরূদ্যান। নাতাশা বলল, লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি। রুমি বলল, বধূ + উক্তি = বধূক্তি।

ইন্দ্রনীল বলল, ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

এইবার তাহলে 'উ' আর 'ঊ'-ধ্বনি সংক্রান্ত সন্ধির নিয়মগুলো লিখি, কেমন? — আমি বললাম।

সূত্র ৩. **উ + উ = ঊ, উ + ঊ = ঊ, ঊ + উ = ঊ, ঊ + ঊ = ঊ**

এতক্ষণ আমরা দেখলাম, দু'টি হ্রস্বস্বর বা হ্রস্বস্বর আর দীর্ঘস্বরের সন্ধিতে সবসময়েই দীর্ঘস্বর জিতে যায়, তাই না?— আমি বলি।

হ্যাঁ— গোটা ক্লাস চিৎকার করে উঠল।

যদিও বাংলায় ধ্বনি হ্রস্ব-দীর্ঘ হয় না বা 'অ' আর 'আ' মোটেই এক নয়, তবু সংস্কৃত স্বরসন্ধিতে যে হ্রস্ব-দীর্ঘের লড়াইয়ে দীর্ঘস্বর জিতবেই, এটা সকলেই বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই। এইবার দেখা যাক এমন কিছু সন্ধি যেখানে কোনো ধ্বনিই জেতে না। — আমি বললাম।

কৌশিক বলল, সেই যে 'সূর্যোদয়' বলেছিলেন, সেইরকম?

আমি ওর স্মরণশক্তির তারিফ করে বললাম, হ্যাঁ, যুদ্ধে যেমন অনেকসময় দুই পক্ষই বাধ্য হয়ে মাঝামাঝি কোনো শর্তে এসে রফা করে, এ-ও অনেকটা তেমনই।

বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

শুভ + ইচ্ছা = ————
নর + ইন্দ্র = ————

বলো তো, কী উত্তর হবে? — জিজ্ঞেস করলাম আমি।

অপু বলল, প্রথমটা হবে 'শুভেচ্ছা'।

রাহুল বলল, পরেরটা হবে 'নরেন্দ্র'।

এইখানে দ্যাখো, প্রথম শব্দের শেষে সংস্কৃত উচ্চারণ অনুযায়ী আছে 'অ'। আর দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে 'ই'। অথচ সন্ধি হলে আসছে 'এ'-ধ্বনিটি। কেন হচ্ছে এমনটা?

এই প্রশ্নের উত্তর কেউই দিতে পারল না। আমি জানতাম, কেউ পারবে না। একটু সময় নিলাম। তারপর বোর্ডে ফিরে গিয়ে বললাম —

এই ছবিটা নিশ্চয়ই তোমাদের সবার মনে আছে —
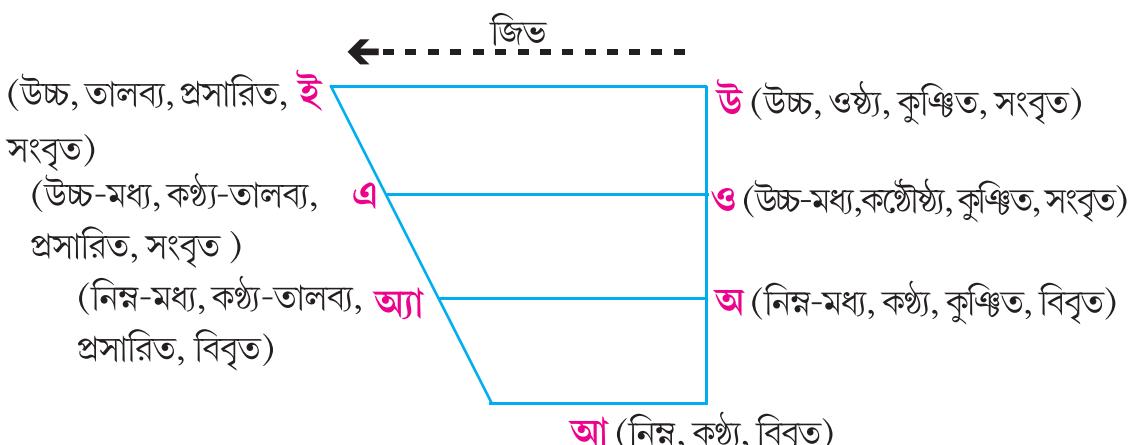
প্রায় সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। আমি বলতে থাকলাম, আগে 'অ' আর পরে 'ই' থাকলে কেন 'এ' চলে আসছে তা এবার স্পষ্ট হয়ে যাবে। দেখো, 'অ' নিম্ন-মধ্য, পশ্চাৎ স্বরধ্বনি আর 'ই' হলো উচ্চ, সম্মুখ স্বরধ্বনি। সুতরাং পরপর 'অ' আর 'ই' বলতে জিভকে পরিশ্রম করতে হচ্ছে বেশ খানিকটা। জিভ সেই পরিশ্রম বাঁচাল মাঝামাঝি 'এ' ধ্বনিতে এসে। 'এ' উচ্চ-মধ্য, সম্মুখ ধ্বনি, 'অ' এবং 'ই'-এর ঠিক মাঝখানে। বলো তো, 'অ' থেকে 'ই' বেশি কাছে না, 'অ' থেকে 'এ' বেশি কাছে? সবাই বলল, 'এ' বেশি কাছে।

ঠিক কথা। ছবি দেখলেই বুঝতে পারা যাবে কেন[(অ + ই) = এ] হলো।
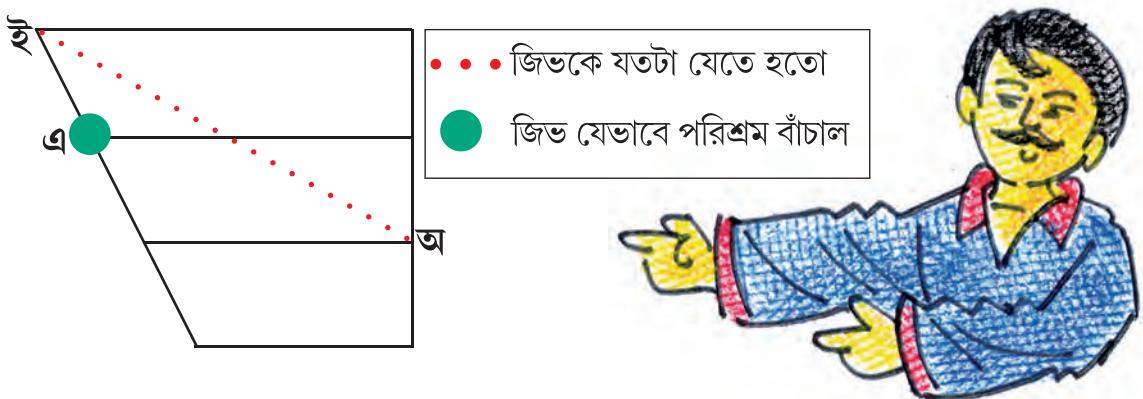
নুসরত হঠাৎ বলল, আচ্ছা! 'অ'-এর পরে 'ই' না থেকে যদি 'ঈ' থাকে তাহলেও কি এমনই হবে?

আলবাত হবে। আমি বললাম, হ্রস্ব স্বর আর দীর্ঘস্বর তো একই ধ্বনির ছোটো আর বড়ো রূপ। তাদের উচ্চারণ স্থান তো আর আলাদা নয়। সুতরাং বোঝা গেল, 'অ'-এর পর 'ই' বা 'ঈ' থাকলে তা 'এ' হয়ে যায়। এক কথায়, অ + ই/ঈ = এ

বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

বোর্ডে এসে অভী লিখল,

ওরা বেঞ্চে ফিরে যেতে আমি বললাম, 'অ'-এর মতো 'আ'-র পরেও 'ই' বা 'ঈ' থাকলে 'এ' হয়ে যায়। কারণটাও একই। ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে।
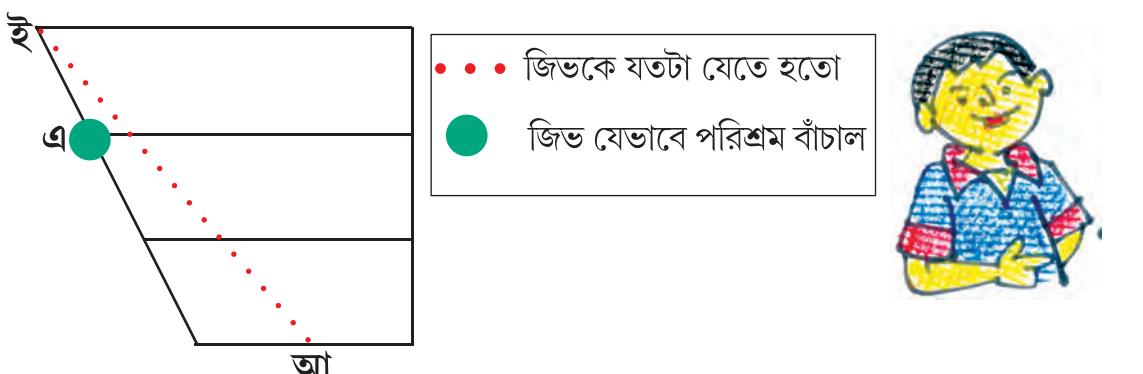
বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

মহা + ইন্দ্র = ____________
রমা + ঈশ = ____________

ছেলেমেয়েরা চেঁচাতে লাগল, ওটা 'মহেন্দ্র' হবে। পরেরটা হবে 'রমেশ'।

আর তারপর বড়ো-বড়ো করে লিখে দিলাম,

সূত্র ৪. অ + ই = এ , অ + ঈ = এ , আ + ই = এ , আ + ঈ = এ

এরপর আমি মুখের ভিতরে জিভের অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণস্থানের ছবিটি দেখিয়ে এবার জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, 'অ' বা 'আ'-এর সঙ্গে 'ই' বা 'ঈ'-এর সন্ধিতে যদি মাঝামাঝি ধ্বনি 'এ' চলে আসে তবে 'অ' বা 'আ'-র সঙ্গে 'উ'-ধ্বনির মিলনে কে সন্ধিস্থাপন করবে বলে মনে হয়, বলো তো।

মিনিট খানেক নীরবতার পর প্রথমে কৌশিক বলল, আমার মনে হচ্ছে 'ও' হবে।

কেন ? কেন ? — আমি সোৎসাহে প্রশ্ন করলাম।

রত্না বলল, কেননা 'অ' আর 'উ' হলো এর ঠিক মাঝখানে আছে 'ও'। 'আ'-র সঙ্গে 'উ'-এর সন্ধিতেও 'ও'-ই মাঝামাঝি জায়গায় আছে বলে 'ও' উচ্চারণ করতেই জিভের সুবিধে।

ঠিক কথা। — তারপর বললাম, নীচের ছবি দেখলেই বুঝবে।
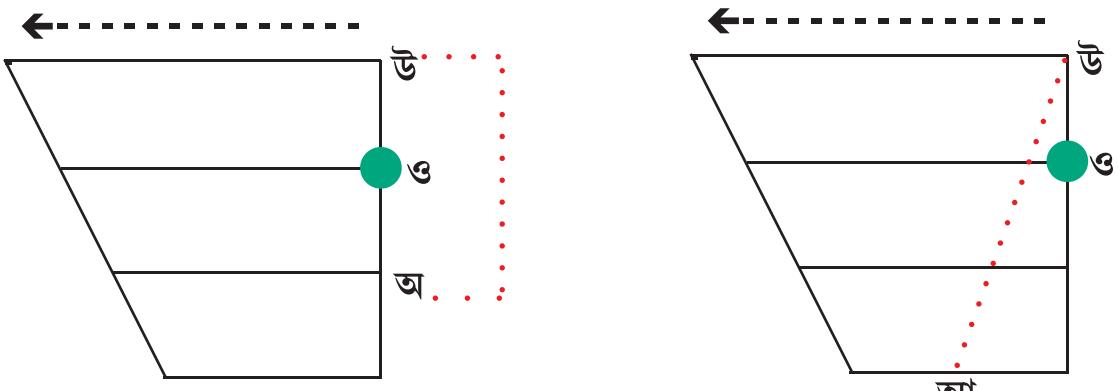
বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

তীর্থ + উদক = ____________	চল + ঊর্মি = ____________
যথা + উচিত = ____________	মহা + ঊর্মি = ____________

ছেলেমেয়েরা এবার চলে এল বোর্ডে। লিখল,

তীর্থ	+	উদক	=	তীর্থোদক	চল	+	ঊর্মি	=	চলোর্মি
যথা	+	উচিত	=	যথোচিত	মহা	+	ঊর্মি	=	মহোর্মি

আমি বড়ো বড়ো করে সূত্র লিখলাম,

সূত্র ৫. অ + উ = ও , অ + ঊ = ও , আ + উ = ও , আ + ঊ = ও

এতদূর আলোচনার পর আমি একটু থেমে বললাম, আসলে আমাদের বর্ণমালায় তো ‘অ’, ‘আ’, ‘ই’, ‘ঈ’, ‘উ’, ‘ঊ’, ‘ঋ’ — এই ক্রমে বর্ণগুলি সাজানো রয়েছে। ‘উ/ঊ’ সংক্রান্ত সন্ধির পরে স্বাভাবিকভাবেই তাই ‘ঋ’ নিয়ে আলোচনা জরুরি। ‘ঋ’ কে আমরা স্বরধ্বনি বলি বটে কিন্তু বাংলায় এর উচ্চারণ ‘রি’ (র্ + ই)। অথচ সংস্কৃত স্বরসন্ধির নিয়মে ‘ঋ’-কে বাদ দেওয়ার কোনো উপায় নেই। এই নিয়ম মেনে তৈরি বেশ কিছু শব্দ বাংলায় আকছার ব্যবহৃত হয়। আমরা লিখি ‘ঋতু’, কিন্তু বলি ‘রিতু’। বাংলা স্বরধ্বনির আলোচনায় তাই ‘ঋ’-কে আনা চলে না।

আমি আবারও থামলাম। তারপর বললাম, তবু সংস্কৃত স্বরসন্ধির নিয়ম মেনে দেখা যাক ‘অ’ বা ‘আ’-র সঙ্গে ‘ঋ’-এর সন্ধিতে কী ঘটনা ঘটে।

বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

দেব	+	ঋষি	=	————
মহা	+	ঋষি	=	————

অন্তরা বলল, আচ্ছা, প্রথমটা কি ‘দেবর্ষি’ হবে?

আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ।

সন্দীপ বলল, আর পরেরটা ‘মহার্ষি’?

অন্তরা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ধ্যাত! ‘মহার্ষি’ বলে কোনো শব্দ হয় না কি? হয় ‘মহর্ষি। আমরা পড়েছি না,রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ‘মহর্ষি’ বলা হতো।

আমি হেসে বললাম, কিন্তু সন্দীপের কোনো দোষ নেই। যদি [(অ + ঋ) = ‘অর্’] হয়, তবে [(আ + ঋ) = ‘আর্’] ভেবে ও কোনো ভুল করেনি। তবে কিনা বেশিরভাগ সময়ে [(আ + ঋ) = অর্] হয়ে থাকে।

যেমন,

[(অ + ঋ) = অর্] — দেব + ঋষি = দেবর্ষি

[(আ + ঋ) = অর্] — মহা + ঋষি = মহর্ষি

তবে ‘আ’-র পরে ‘ঋত’ শব্দটি থাকলে [(আ + ঋ) = আর্] হয়ে থাকে।

যেমন, পিপাসা + ঋত = পিপাসার্ত শীত + ঋত = শীতার্ত

বোর্ডে বড়ো করে নিয়মটা লিখে দিলাম,

সূত্র ৬. (অ + ঋ) = অর্ , (আ + ঋ) = অর্ কিন্তু, (আ + ঋত) = আর্

বেশ, এবার আসা যাক 'এ' আর 'ঐ' - ধ্বনির প্রসঙ্গে।— আমি বললাম, তবে এখানেও সমস্যা আছে 'ঐ'-ধ্বনিটি নিয়ে। বুঝতেই পারছ, 'ঐ'-এর মধ্যে দুটো স্বরধ্বনি আছে। একে তাই বলা হয় 'দ্বিস্বর'। বাংলায় আমরা বলি 'ওই' বা 'অই', সংস্কৃত ভাষায় বলা হতো 'আই'। ধ্বনির উচ্চারণ স্থানের ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে বাংলায় 'ওই'-উচ্চারণে জিভের পরিশ্রম কমানোর চেষ্টা রয়েছে।—এই পর্যন্ত বলে থামলাম।

পরে আবার বলতে শুরু করলাম, এবার দেখা যাক 'অ' বা 'আ'-এর পরে 'এ' বা 'ঐ' থাকলে কী হতে পারে।

বোর্ডে লিখলাম,

জন + এক = জনৈক	মত + ঐক্য = মতৈক্য

কী ধরা পড়ল তোমাদের চোখে? — আমি জিজ্ঞেস করলাম।

পুলক বলল, (অ + এ) থাকলে সেটা 'ঐ' হয়ে যাচ্ছে দেখলাম। (অ + ঐ) থাকলেও তা-ই হচ্ছে।

আমি বললাম, ঠিক কথা, উচ্চারণের দিক থেকে দ্যাখো, পাশাপাশি 'অ-এ', 'অ-এ' বারবার উচ্চারণ করা বেশ অসুবিধেজনক। তাই দুটি আলাদা স্বরকে একটি দ্বি-স্বরে পালটে নিয়ে পরিশ্রম কমিয়ে তাকে করে নেওয়া হলো 'ওই'।

আমি বললাম, শুধু 'অ' নয়, 'আ'-এর পরেও 'এ' বা 'ঐ' থাকলে একই জিনিস ঘটবে।

বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

সদা + এব = সদৈব	মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

আর এবার নিয়মটাও লিখে দিলাম,

সূত্র ৭. অ + এ = ঐ, আ + এ = ঐ, অ + ঐ = ঐ, আ + ঐ = ঐ

আচ্ছা, এবার কোন কোন ধ্বনির কথায় আসব আমরা? — আমি জিজ্ঞেস করি।

নিশ্চয়ই 'ও' আর 'ঔ'। — সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে কচিকাঁচার দল।

ঠিক কথা। 'অ' বা 'আ'-এর পরে 'ও' বা 'ঔ' থাকলে কী হয় দেখা যাক।

বোর্ডে লিখলাম,

বন + ওষধি = বনৌষধি	মহা + ওষধি = মহৌষধি
পরম + ঔষধ = পরমৌষধ	মহা + ঔদার্য = মহৌদার্য

কী দেখলে বলো। — আমি বলি।

গুলশন বলল, দেখলাম যে, 'অ' বা 'আ'-এর পরে 'ও' বা 'ঔ' থাকলে সবটা মিলে 'ঔ' হয়ে যাচ্ছে।

হুঁ, ঠিক। — আমি বলি। কিন্তু এখানেও খেয়াল রেখো, 'ঐ'-এর মতো 'ঔ'-ও দ্বি-স্বর। তাই নিয়মটাও হবে আগের মতোই —

সূত্র ৮. অ + ও = ঔ, অ + ঔ = ঔ, আ + ও = ঔ, আ + ঔ = ঔ

এতক্ষণ যত সন্ধি শিখেছি সবেতেই প্রথমে ছিল 'অ' বা 'আ', শেষে অন্যান্য স্বরধ্বনি। এই বার দেখা যাক প্রথমেই 'ই' বা 'ঈ' থাকলে কী হয়। — আমি বললাম।

বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

বি + অবস্থা = ব্যবস্থা	প্রতি + অক্ষ = প্রত্যক্ষ

সন্ধ্যা জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, ই-কার চলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু য-ফলা কেন আসছে, তা তো বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, হুম্! ভালো প্রশ্ন করেছ। এর উত্তর জানতে হলে আগে চিনতে হবে ওই য-ফলা বা অন্তঃস্থ য-কে।

সবাই বলে উঠল, কেন? কেন?

বাংলায় অন্তঃস্থ য-কে আমরা উচ্চারণ করি বর্গীয় জ-এর মতো, লিখি 'যাত্রা', বলি 'জাত্রা', সংস্কৃতে কিন্তু এর উদাহরণ ছিল 'ইঅ' আর 'ইআ'-র কাছাকাছি। ইংরাজিতে লিখলে হবে 'ya'-র মতো। সুতরাং, 'য' = ইঅ/ইআ হলে বোঝাই যাচ্ছে যে আগের 'ই' আর পরের 'অ' মিলে য-ফলা স্বাভাবিকভাবেই চলে আসবে।

নিয়মটা হবে এইরকম, ই + অ = য

একইভাবে 'ই'-এর পর 'আ' থাকলে কী হয় দেখা যাক ...

বোর্ডে লিখলাম,

অতি + আচার = অত্যাচার

ই + আ = যা

একইভাবে দেখো .... — বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

অধি	+	উষিত	=	অধ্যুষিত	[(ই + উ) = যু]
প্রতি	+	ঊষ	=	প্রত্যূষ	[(ই + ঊ) = যূ]
প্রতি	+	এক	=	প্রত্যেক	[(ই + এ) = যে]
অতি	+	ঐশ্বর্য	=	অত্যৈশ্বর্য	[(ই + ঐ) = যৈ]

আবার 'ঈ'-র ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে। যেমন, নদী + অম্বু = নদ্যম্বু [(ঈ + অ) = য]।

সূত্র ৯. ই + অ = য, ই + আ = যা, ই + উ = যু, ই + ঊ = যূ
ই + এ = যে ই + ঐ = যৈ, ঈ + অ = য

ঠিক অন্তঃস্থ য-এর মতোই অন্তঃস্থ ব-ও একটি অর্ধ ব্যঞ্জন। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ ছিল 'ওআ'। ইংরাজিতে লিখলে হবে অনেকটা 'wa'-র মতো। বাংলায় যদিও অন্তঃস্থ-ব-এর উচ্চারণ প্রায় হয়ই না। আমরা লিখি 'স্বাধীনতা'। কিন্তু বলি, 'শাধিনতা'।

হঠাৎ ব-ফলার কথা কেন আসছে? — জিজ্ঞেস করল তৌফিক।

কেননা আমরা এবার দেখব আগে 'উ' বা 'ঊ' এবং পরে অন্যান্য স্বরধ্বনি থাকলে কী হয়। — আমি বললাম।

বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

সু + অল্প = স্বল্প }	(উ + অ) = অন্তঃস্থ ব
সু + আগত = স্বাগত }	(উ + আ) = (অন্তঃস্থ ব + আ)
অনু + ইত = অন্বিত }	(উ + ই) = (অন্তঃস্থ ব + ই)
তনু + ঈ = তন্বী }	(উ + ঈ) = (অন্তঃস্থ ব + ঈ)
অনু + এষণ = অন্বেষণ }	(উ + এ = (অন্তঃস্থ ব + এ)

অর্থাৎ দ্যাখো, 'উ'-এর পর স্বরধ্বনি থাকলে 'উ'-এর জায়গায় অন্তঃস্থ ব আসছে আর ওই পরের স্বরটি অন্তঃস্থ র-এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। 'ঊ'-এর পর অন্য স্বরধ্বনি থাকলেও একই ব্যাপার ঘটবে।— আমি বলি।

বোর্ডে লিখলাম,

পূ + ইত্র = পবিত্র	(ঊ + ই) = (অন্তঃস্থ ব + ই)

এবার তাহলে সূত্রগুলো লিখি— আমি বললাম।

সূত্র ১০. উ + অ = ব, উ + ই = বি, ঊ + আ = বা, উ + আ = বা, উ + ঈ = বী, ঊ + ই = বি, উ + এ = বে

আগে আমরা দেখেছি 'অ' বা 'আ'-র পরে 'ঋ' থাকলে কী হয়। এবার দেখা যাক আগে 'ঋ'-এর পরে 'ঋ' ছাড়া অন্য স্বরধ্বনি থাকলে সংস্কৃত স্বরসন্ধির ক্ষেত্রে কী হতো।— আমি বললাম।

বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

পিতৃ	+	অর্থ	=	পিত্রর্থ	ধাতৃ	+	ঈ	=	ধাত্রী
পিতৃ	+	আদেশ	=	পিত্রাদেশ	পিতৃ	+	উপদেশ	=	পিত্রুপদেশ
পিতৃ	+	ইচ্ছা	=	পিত্রিচ্ছা	পিতৃ	+	ঐশ্বর্য	=	পিত্রৈশ্বর্য

সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে, কী বুঝলে, বলো দেখি।

প্রবীর বলল, 'ঋ-কারগুলো সব র-ফলা, মানে 'র' হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

মৌসুমী বলল, আর পরের স্বরধ্বনিগুলো ঋ-ফলার সঙ্গে যে ব্যঞ্জনধ্বনি, তার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে।

ঠিক কথা।— আমি বললাম। আগেও বলেছি 'ঋ' বাংলায় মোটেই স্বরধ্বনি নয়, তবু সংস্কৃত স্বরসন্ধির নিয়ম মেনে আমরা এই সন্ধিগুলিও শিখে রাখলাম। চলো, এবার সূত্রগুলোকে একসঙ্গে লিখে ফেলা যাক।

সূত্র ১১.

ঋ + অ = র	ঋ + ই = রি	ঋ + উ = রু
ঋ + আ = রা	ঋ + ঈ = রী	ঋ + ঐ = রৈ

সংস্কৃত স্বরসন্ধির নিয়ম শেখা প্রায় শেষ। আর একটা-দুটো নিয়ম আছে। সেই নিয়মে তৈরি খুব বেশিসংখ্যক শব্দও নেই। কিন্তু শব্দগুলি বেশ প্রচলিত। সুতরাং, আমি আবার শুরু করলাম। বোর্ডে গিয়ে লিখলাম, নে + অন = ——————

তারপর ফিরে ক্লাসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, বলো তো এখানে কী হতে পারে?

গোটা ক্লাস চুপ করে আছে। শংকর হঠাৎ বিড়বিড় করতে-করতে বলল, 'নয়ন'?

আমি খুব খুশি হয়ে বললাম, 'নয়ন'-ই তো। কী করে বুঝলে?

শংকর বলল, বারবার 'নে-অন', 'নে-অন' বলতে বলতে কেমন যেন নিজে থেকেই 'নয়ন' হয়ে গেল। আর এর কাছাকাছি শুনতে অন্য কোনো শব্দ-ও মনে হয় নেই।

তারপর বললাম, এই যে দুটি স্বরধ্বনি 'এ' আর 'অ'-এর সন্ধিতে 'য়', অর্থাৎ অর্ধস্বর চলে আসছে, এটা বেশ স্বাভাবিক। তাড়াতাড়ি উচ্চারণের ফলে এক ধ্বনির স্থান থেকে আর এক ধ্বনির স্থানে পৌঁছনোর সময় জিভ অনেক ক্ষেত্রে মাঝখানে অন্য একটি ধ্বনি উচ্চারণ করে ফেলে। দুই স্বরধ্বনির মধ্যে এইরকম আচমকা ব্যঞ্জন ধ্বনি এসে পড়াকে শ্রুতি ধ্বনি বলা হয়। এইখানে আমরা যেমন দেখছি য়-শ্রুতি। বাংলাতেও এমনটা হয়। যেমন তোমরা যদি 'কে এল?' — কথাটা কয়েকবার বলো তাহলে নিজেরাই বুঝবে সেটা 'কেয়েলো?' হয়ে যাচ্ছে।

অপালা বলল, কিন্তু এখানে তো 'নেয়ন' হচ্ছে না।

আমি বললাম, ঠিক ধরেছ, অনেক সময় শ্রুতিধ্বনির আগমনের সময় কোনো একটি স্বর লুপ্ত হয়। এখানে দেখব 'এ' লুপ্ত হয়ে তার জায়গায় 'অয়' হচ্ছে। 'অ' আগের ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আর 'য়' পরের স্বরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এইবার তবে সূত্রটা লিখে নিই–

সূত্র ১২. এ + অ = অয়্

তাহলে এবার বলো, এইটা কী হবে? — আমি রহস্যের ভাব মুখে এনে বোর্ডে গেলাম, লিখলাম,

গৈ + অক = ——————

তিরিশ সেকেন্ড নীরবতার পরেই একসঙ্গে অনেকগুলো দিক থেকে উত্তর ভেসে এল— 'গায়ক, গায়ক'।

ঠিক উত্তর। তারপর বললাম, বুঝতেই পারছ, এখানেও য়-শ্রুতি কাজ করছে। খালি খেয়াল

করো যে, [(এ + অ) = অয়] হচ্ছে, কিন্তু (ঐ + অ) হয়ে যাচ্ছে 'আয়'। অর্থাৎ, 'ঐ' লুপ্ত হচ্ছে, তার জায়গায় 'আয়' হয়ে 'আ' আগের ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আর 'য়' যুক্ত হচ্ছে পরের স্বরের সঙ্গে।

সূত্র ১৩. ঐ + অ = আয়্

য়-শ্রুতির মতোই ব-শ্রুতি, অর্থাৎ অন্তঃস্থ-ব ও শ্রুতিধ্বনির কাজ করতে পারে। এখনও বাংলায় কোনো কোনো শব্দে ব-শ্রুতি দেখা যায়। যেমন, 'যাআ' না বলে আমরা বলি আর লিখি 'যাওয়া'। সংস্কৃত স্বরধ্বনিতেও ব-শ্রুতির ভূমিকা রয়েছে। লিখলাম, ভো + অন = ভবন

তারপর বললাম, দ্যাখো এখানে 'ও' এবং 'অ' ধ্বনির মাঝখানে অন্তঃস্থ-ব- ঢুকে পড়ে শ্রুতিধ্বনির কাজ করছে। তরপর অবশ্য বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ রীতিতে অন্তঃস্থ-ব পালটে হয়ে গেছে বর্গীয়-ব। অর্থাৎ, 'ও'-এর পরে 'অ' থাকলে 'ও' বদলে হয়ে যাচ্ছে 'অব্'। অ' আগের ব্যঞ্জনে যুক্ত হচ্ছে, 'ব্' পরের স্বরধ্বনি 'অ'-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।
বড়ো করে সূত্রটা লিখলাম—

সূত্র ১৪. ও + অ = অব্

শ্রুতিধ্বনির ব্যাপারটা নিয়ে সবাইকে বেশ চিন্তিত দেখা গেল। আমি অবশ্য আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

ঠিক যেমন [(ও+অ) = অব্] হচ্ছে, তেমনই (ঔ + অ) হয়ে যাবে 'আব্'।

বোর্ড গিয়ে লিখলাম,

পৌ	+	অক	=	পাবক
স্তৌ	+	অক	=	স্তাবক

তারপর লিখলাম,

নৌ	+	ইক	=	————
ভৌ	+	উক	=	————

রত্না বলল, প্রথমটা মনে হয় 'নাবিক' হবে।

অ্যালেক্স বলল, দ্বিতীয়টা বোধহয় হবে 'ভাবুক'।

আমি ওদের দুজনকে সমর্থন জানালাম। তারপর বললাম, ''এখানেও ব-শ্রুতির ভূমিকা দেখতে পেলে নিশ্চয়ই। যা দেখা গেল 'ঔ'- এর পরে অন্য স্বরধ্বনি থাকলে 'ঔ' লুপ্ত হয়ে 'আব্' হয়ে যায়। 'আ' আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয় আর 'ব্' পরের স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়। অন্তঃস্থ-ব স্বাভাবিকভাবেই বর্গীয়-ব-এর মতোই শুনতে লাগে।

সূত্রগুলো লিখে ফেললাম,

সূত্র ১৫. ঔ + অ = আব্, ঔ + ই = আবি, ঔ + উ = আবু

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি

সংস্কৃত স্বরধ্বনির নিয়ম সবই শেখা হয়ে গেছে। কিন্তু এছাড়া আরও কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলি আগের নিয়ম-কানুন মেনে তৈরি হয়নি। এইসব শব্দগুলিকে বলা হয় 'নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি'।" — আমি বললাম।

'নিপাতনে সিদ্ধ' —নামটি নিয়ে সবাই বেশ হাসাহাসি করতে লাগল।

আমি বললাম, 'পাতন' শব্দের অর্থ 'ক্ষেপন ' বা 'ফেলা'। আর 'নি' মানে 'না'। অর্থাৎ, যে সমস্ত শব্দকে স্বরসন্ধির কোনও নিয়মের আওতায় ফেলা চলে না অথচ যেগুলি ব্যাকরণগতভাবে সিদ্ধ, তাদেরকেই বলা হয় নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি। এখন কয়েকটা এইরকম সন্ধির উদাহরণ দেওয়া যাক—

বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

প্র+ঊঢ় = প্রৌঢ়	[অ + ঊ = ঔ],	[অ + ঊ = ও] নয়।
গো+ অক্ষ = গবাক্ষ	[ও + অ = অবা],	[ও + অ = অব্] নয়।
সীমা + অন্ত = সীমান্ত	[আ + অ = অ],	[আ + অ = আ] নয়।
অক্ষ + ঊহিনী = অক্ষৌহিনী	[অ + ঊ = ঔ],	[অ + ঊ = ও] নয়।
বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ	[অ + ও = ও],	[অ + ও = ঔ] নয়।
স্ব + ঈর =স্বৈর	[অ + ঈ = ঐ],	[অ + ঈ = এ] নয়।

খাঁটি বাংলা স্বরসন্ধি

এইবার খাঁটি বাংলা ভাষার স্বরসন্ধির কতগুলি নিয়ম শিখব। বুঝতেই পারছ, বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে এখানে সন্ধির নিয়ম বেশ শিথিল। মূলত উচ্চারণ নির্ভর এই নিয়মগুলি। –আমি বলি।

বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

বাপ + অন্ত = বাপান্ত [(অ + অ) = আ]	জেঠা + আমি = জেঠামি [(আ + আ) = আ]
চাষ+আবাদ = চাষাবাদ [(অ + আ) = আ]	ভাঙা + আনি = ভাঙানি [(আ + আ) = আ]

দেখো, বাংলাতেও সংস্কৃত স্বরসন্ধির মতোই এক নিয়ম অনুসৃত হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দে সন্ধি নিষিদ্ধ। তবে বাংলায় এমন প্রচুর শব্দ রয়েছে যেখানে এই ধরনের সন্ধি হয়। অশুদ্ধতার দোহাই দিয়ে এগুলিকে অস্বীকার করা উচিত নয়।

যেমন, দিল্লি + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর [(ই + ঈ) = ঈ

অর্থাৎ, বাংলা স্বরসন্ধি অনেকটাই সংস্কৃতের সঙ্গে অভিন্ন। এইবার আবার সূত্রগুলি লিখে দিই।

সূত্র ১. (অ/আ) + (অ/আ) = আ, (ই/ঈ) + (ই/ঈ) = ঈ,
(অ/আ) + (ই/ঈ) = এ

সূত্র ২. বাংলায় ‘এক’-শব্দটি ‘মোটামুটি’ -অর্থে ব্যবহার হলে ‘এ’ ধ্বনিটি আগের শব্দের ‘অ/ও’-কার বা হলন্ত অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

তিল	+	এক	=	তিলেক	আধ	+	এক	=	আধেক
অর্ধ	+	এক	=	অর্ধেক	দশ	+	এক	=	দশেক

সূত্র ৩. ‘এক ’এবং ‘এর’ প্রত্যয়ের আগে ‘অ’ -ছাড়া অন্য স্বরধ্বনি থাকলে এ-কার লুপ্ত হয়।

বোর্ডে লিখলাম,

খানি	+	এক	=	খানিক
কলকাতা	+	এর	=	কলকাতার

সূত্র ৪. ‘ই’-কার ও ‘ও’-কারের আগের ‘অ’-কার লুপ্ত হয় এবং ‘ই’ বা ‘ও’ আগের হলন্তধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়।”

বোর্ডে লিখলাম,

আমার	+	ই	=	আমারি	তোমার	+	ও	=	তোমারো
সবার	+	ই	=	সবারি	কার	+	ও	=	কারো

সূত্র ৫. পাশাপাশি থাকা দু’টি স্বরধ্বনির পরবর্তী স্বরটি লুপ্ত হয়,

যেমন— যা + ইচ্ছে + তাই = যাচ্ছেতাই

আবার কখনও আগেরস্বরটিও লুপ্ত হতে পারে।

যেমন — মিথ্যা + উক = মিথ্যুক

বাংলা স্বরসন্ধির নিয়মগুলিও প্রায় সবই আলোচিত হলো। আমার ক্লাসের খুদে বৈয়াকরণরা এখন থেকে দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহার থেকেই ব্যাকরণের সূত্রগুলির সন্ধান করবে, এমনটাই আমার বিশ্বাস।

সেই বিশ্বাসকেই প্রত্যয়ে পরিণত করে সন্ধ্যা হঠাৎ বলল, আচ্ছা, এই যে আমরা লিখি একরকম, বলি আর একরকম — এইটা কি শুধু বাংলা ভাষাতেই হয় ?

আমি হেসে বললাম, কখ্‌খনো না। সব ভাষাতেই অল্প-বিস্তর এমনটা ঘটে থাকে। কেননা, আগেই বলেছি, মুখের ভাষা যত তাড়াতাড়ি বদলায়, তার ব্যাকরণ বা বানান তত তাড়াতাড়ি বদলাতে পারে না। শুধু বাংলা বাংলা নয়, ইংরেজি ভাষাতেও যে উচ্চারণ আর বানান সবসময় এক হয় না, তা বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই। পৃথিবীর সব ভাষা সম্বন্ধেই একথা সত্যি। তবু বিভিন্ন ধ্বনির উচ্চারণস্থানগুলি মনে রাখতে পারলে সন্ধির মতোই বানানেও আর অসুবিধে হবে না। কেননা, মোটামুটি কাছাকাছি থাকা ধ্বনিগুলিকেই একটি শব্দে ব্যবহারের প্রবণতা রয়েছে সব ভাষাতেই। ধ্বনি পরিবর্তন কেন হয়, তা-ও আর বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। কি, ভুলবে না তো স্বরসন্ধির নিয়মগুলো ?

সন্ধ্যা সহ গোটা ক্লাস মাথা নাড়ল। বাইরের আলোভরা চারপাশের মতোই ওদের মুখগুলিও তখন ঝলমল করছে।

হাতে কলমে

১ . জিভ কীভাবে পরিশ্রম বাঁচালো, ছবি এঁকে দেখাও :

১.১ পর + ঈশ = পরেশ   ১.২ যথা + উপযুক্ত = যথোপযুক্ত

১.৩ মত + ঐক্য = মতৈক্য   ১.৪ উত্তর + উত্তর = উত্তরোত্তর

১.৫ জল + উচ্ছ্বাস = জলোচ্ছ্বাস   ১.৬ সুপ্ত + উত্থিত = সুপ্তোত্থিত

২. কেন এমন হলো, যুক্তি দাও :

২.১ হত + আশ = হতাশ   ২.২ দ্বি + ইপ = দ্বীপ

২.৩ জীমূত + ইন্দ্র = জীমূতেন্দ্র   ২.৪ আদ্য + উপান্ত = আদ্যোপান্ত

২.৫ ব্রহ্ম + ঋষি = ব্রহ্মর্ষি   ২.৬ ইতি + অবসর = ইত্যবসর

২.৭ প্রতি + উষ = প্রত্যুষ   ২.৮ অনু + ইত = অন্বিত

২.৯ পিতৃ + উপদেশ = পিত্রুপদেশ   ২.১০ নৌ + ইক = নাবিক

২.১১ নে + অন = নয়ন   ২.১২ ভো + অন = ভবন

৩. অশুদ্ধি সংশোধন করো :
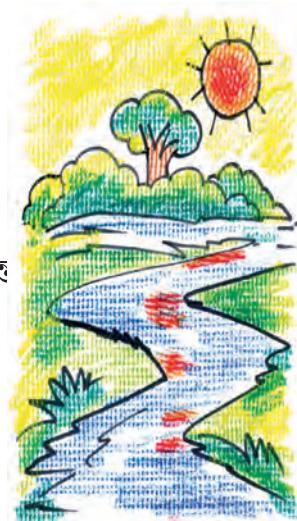
৩.১ পশু + অধম = পশ্বাধম

৩.২ শুদ্ধ + উদন = শুদ্ধোদন

৩.৩ মৃত্যু + উত্তীর্ণ = মৃত্যুত্তীর্ণ

৩.৪ অনুমতি + অনুসারে = অনুমত্যানুসারে

৩.৫ অধি + উষিত = অধ্যুষিত

৩.৬ কোটি + ক = কোটিক

৩.৭ রাজা + ঋষি = রাজর্ষি

৩.৮ পো + অক = পাবক

৩.৯ কলকাতা + র = কলকাতার

৩.১০ ভো + উক = ভাবুক

৪. সন্ধি করো :

৪.১ স্তৌ + অক =

৪.২ সীমা + অন্ত =

৪.৩ অব + ঈক্ষণ =

৪.৪ পূ + ইত্র =

৪.৫ অনু + অয় =

৪.৬ বি + অতীত =

৪.৭ গৃহ + অভ্যন্তর =

৪.৮ মরু + উদ্যান =

৪.৯ অন্ত্য + ইষ্টি =

৪.১০ অতি + উক্তি =

৪.১১ ক্ষুধা + ঋত =

৪.১২ প্রতি + অক্ষ =

৫. সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

৫.১ অশ্বারোহী

৫.২ দাবানল

৫.৩ মহর্ষি

৫.৪ দ্বিপেন্দ্র

৫.৫ অপেক্ষা

৫.৬ গবাক্ষ

৫.৭ তীর্থোদক

৫.৮ ব্যবস্থা

৫.৯ শয়ন

৫.১০ গবেষণা

৫.১১ ব্যবহার

৫.১২ স্বৈর

বাক্যের কথা

ক্লাসে ঢুকে দেখি সবাই গোল হয়ে বসে একটা খেলা খেলছে। আমায় দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে খেলাটাই দিল বন্ধ করে। আমি বললাম, কী খেলা হচ্ছিল?

বাক্য নিয়ে খেলা।

সে কীরকম খেলা? একটু খেলে দেখাও তো।

প্রথমে কৌশিক একটা ছোট্ট বাক্য বলল, 'বাবা লিখছে'। তারপর কৃশানু বলল, 'বাবা কবিতা লিখছে'। সুমিতা বলল 'বাবা পেন দিয়ে কবিতা লিখছে'। এরপর রত্নার পালা। একটু ভেবে বলল, 'বাবা লাল রঙের পেন দিয়ে কবিতা লিখছে'। তৌফিক রত্নার বাক্যটাই কয়েকবার বিড়বিড় করে বলে তারপর হঠাৎ বলল, 'বাবা উপহার পাওয়া লাল রঙের পেন দিয়ে কবিতা লিখছে'। তৌফিকের পর কিংশুক। কিংশুক তো চুপ। আর কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

আমি বললাম, ওরা সবাই 'লিখছে'-র আগে শব্দ যোগ করেছে। তুমি দেখো তো 'বাবা'-র আগে কিছু যোগ করতে পারো কিনা। এইবার কিংশুক বলল, 'আমার বাবা উপহার পাওয়া লাল রঙের পেন দিয়ে কবিতা লিখছে'। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। আমি বললাম, এই বাক্যকে আরো বড়ো করা যায়। যেমন, 'আমার' আর 'বাবা'র মধ্যে যদি 'বন্ধু' আর 'তৌফিক' কথাটা জুড়ে দিই, তাহলে হবে, 'আমার বন্ধু তৌফিকের বাবা উপহার পাওয়া লাল রঙের পেন দিয়ে কবিতা লিখছে'।

আচ্ছা, একেবারে শুরুতে বাক্যটা ছিল 'বাবা লিখছে'। এর মধ্যে কাজ বোঝাচ্ছে কোন শব্দটা?

সবাই বলল, 'লিখছে'।

বেশ। এবার বলি, কাজ বোঝায় সে শব্দ, তার নাম হলো ক্রিয়া। আর যিনি এই কাজটি করছেন তিনি কর্তা। তাহলে এই বাক্যটায় ক'টা অংশ?

এবারও সবাই বলল, দুটো। কর্তা আর ক্রিয়া। আমি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখলাম:
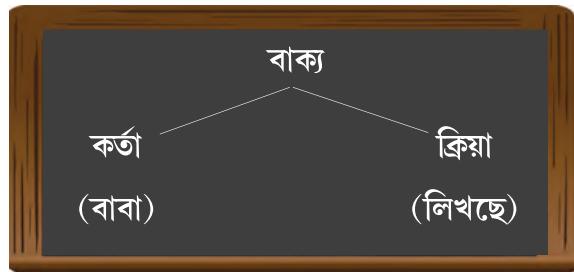
এরপর বাক্যটাকে কীভাবে বড়ো করেছিলে? 'বাবা কবিতা লিখছে'। ক্রিয়াকে যদি প্রশ্ন করি 'কী লিখছে', তাহলে আমরা উত্তর পাব, 'কবিতা'। তাহলে বাক্যটা এবার দাঁড়াল :
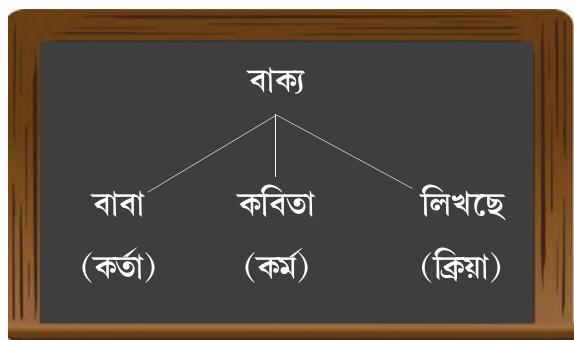
আরেকটা বাক্য নিয়ে দেখো তো তোমরা কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া খুঁজে পাও কিনা। বাক্যটা হলো : 'রমেশ আখতারকে বই দিল।'

প্রথমে বলো ক্রিয়া কোনটা?

অনেকগুলো হাত উঠল। স্বপন বলল, 'দিল'।

বেশ। কর্তা কোন শব্দটা?

এবারও অনেকগুলো হাত উঠল। রাবেয়া বলল 'রমেশ'। কীভাবে বুঝলে যে 'রমেশ' কর্তা?

রাবেয়া বলল, ক্রিয়াকে প্রশ্ন করলাম, 'কে দিল?' উত্তর পেলাম, 'রমেশ'। তাই রমেশ হলো কর্তা। ঠিক বলেছ। এইবার বলো তো 'কর্ম' কোন শব্দটা? কয়েকজন বলল 'বই'। কয়েকজন বলল 'আখতারকে'। যারা বই বলল, তারা যুক্তি দিল যে, ক্রিয়াকে 'কী' করায়, অর্থাৎ 'কী দিল?' প্রশ্ন করায় উত্তর 'বই' পেয়েছে। সুতরাং 'বই' কর্ম। আমি বললাম, যারা 'আখতারকে' বলেছ, তোমাদের যুক্তি কী? তারা একটু আমতা-আমতা করে চুপ করে গেল।

আমি বললাম, তোমরা দু-দলই ঠিক বলেছ। ভুল করেছি আমি। আমার সবটা বলা উচিত ছিল। ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' প্রশ্ন করলে কর্ম পাওয়া যায়। 'কী দিল?'— বই। তেমনি 'কাকে দিল?'—আখতারকে। সুতরাং দুটো কর্ম। কী দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা যে কর্ম পাই, তাকে বলি

মুখ্য কর্ম আর কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা পাই গৌণ কর্ম। তাহলে বাক্যটা দাঁড়াল :
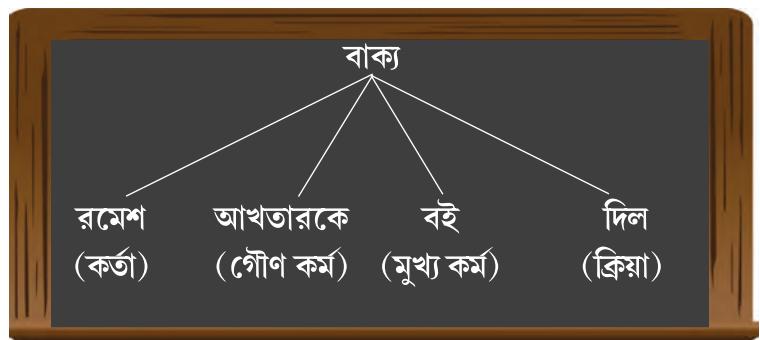
বাক্য যত বড়োই হোক না কেন, এর দুটি অংশ। এই দুটো অংশকে বলে উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যার সম্পর্কে বলা হয় সেই অংশটি উদ্দেশ্য আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা হলে তা বিধেয়। ছোটো বাক্যের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য : বাবা আর বিধেয় : লিখছে। এইবার বাক্য যত বড়ো হয়, তত বড়ো হতে থাকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ। যেমন :
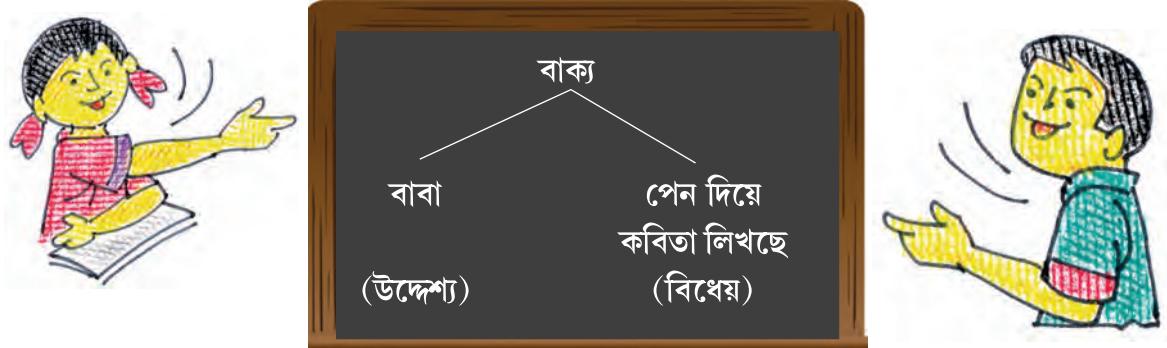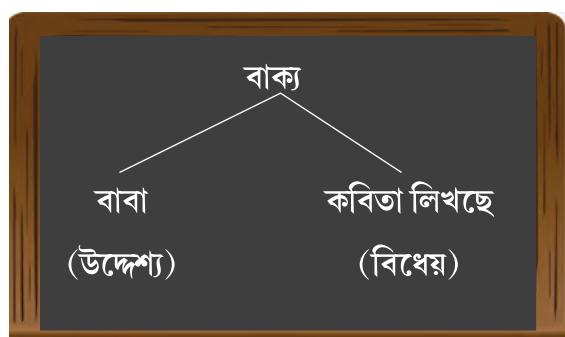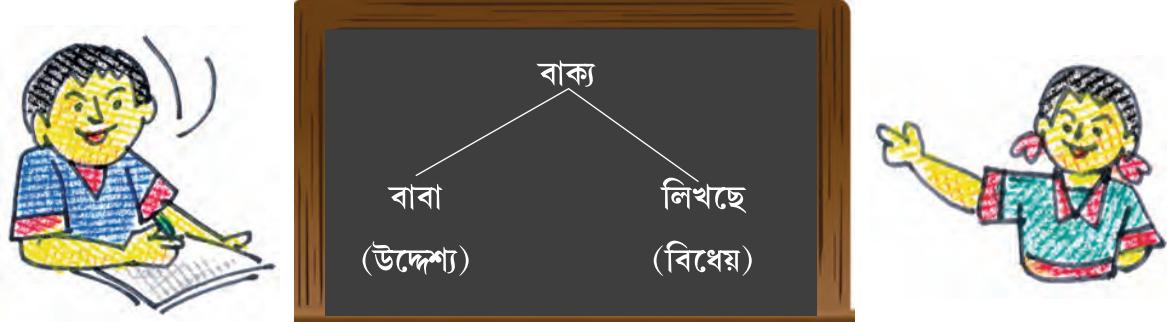
এই 'কবিতা', 'পেন দিয়ে' সবই জুড়ে যাচ্ছে ক্রিয়ার ('লিখছে') সঙ্গে। এগুলোকে আমরা বলতে পারি 'বিধেয়-র সম্প্রসারক',অর্থাৎ যে শব্দগুলো দিয়ে বিধেয় বেড়ে যাচ্ছে। তেমনি আবার
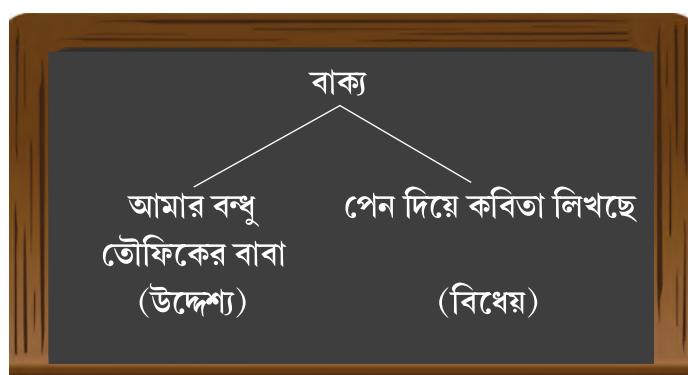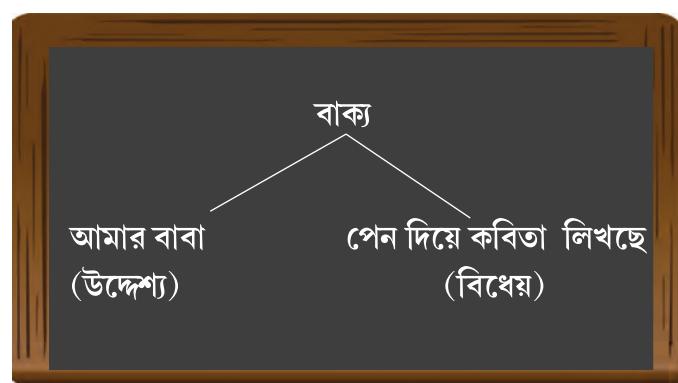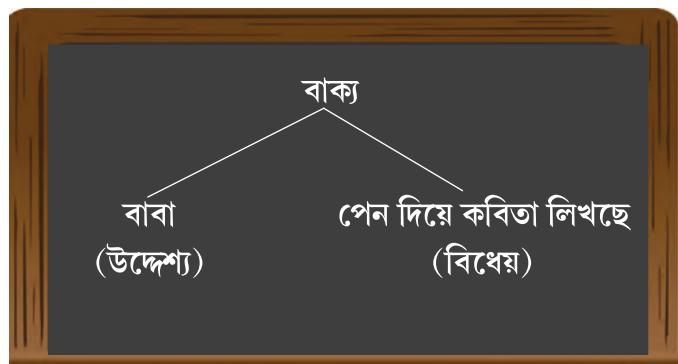
এইবার উদ্দেশ্য অংশটা বড়ো হয়ে গেল। আর 'আমার', 'বন্ধু', তৌফিকের' এই শব্দগুলো হলো উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে আমরা সেক্ষেত্রে কর্তা-খণ্ড আর ক্রিয়া-খণ্ড-ও বলতে পারি। লক্ষ করে দেখো কর্তা আর কর্তার সঙ্গে যা জুড়ে গেছে, সবটাই উদ্দেশ্য আর ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার সঙ্গে যা জুড়ে আছে, সবটাই বিধেয়। ঠিক তেমনি বড়ো বাক্যের ক্ষেত্রেও, উদ্দেশ্য : 'আমার বন্ধু তৌফিকের বাবা' আর বিধেয় : 'উপহার পাওয়া লাল রঙের পেন দিয়ে লিখছে'।

হাতে কলমে

১. **নীচের বাক্যগুলিকে কর্তাখণ্ড ও ক্রিয়াখণ্ডে ভাগ করো :**

১.১ সফিক আর মীনা মেলায় বেড়াতে এসেছে।

১.২ পার্থর বাবা কৃষক অধিবেশনে বক্তৃতা দিলেন।

১.৩ সন্তু আর তোতার ছোটোবোন টিয়া পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে।

১.৪ অয়ন রোজ নিয়ম করে ব্যায়াম করে।

১.৫ স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার সিমলে পাড়ার অধিবাসী ছিলেন।

২. **নীচের বাক্যগুলির কর্তাখণ্ডকে বাড়াও :**

২.১ মাইকেল খেলছে।

২.২ মা তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

২.৩ শচীন তেণ্ডুলকর দুশোটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন।

২.৪ অপালা রোজ মন দিয়ে পড়াশুনা করে।

২.৫ হাবিবুর এক সময় সাঁতরে নদী পার হতো।

৩. **নীচের বাক্যগুলির ক্রিয়াখণ্ডকে বাড়াও :**

৩.১ রামবাবু ক্লাবের সভাপতি। (কোন? কতদিন ধরে?)

৩.২ আয়েষা নাচছে। (কী? কোথায়? কখন?)

৩.৩ নরেন্দ্র বই দিল। (কাকে? কোথা থেকে? কার?)

৩.৪ আব্বাস আর বাবু খেলতো। (কী দিয়ে? কখন? কোথায়?)

৩.৫ বীরেন ঘুমায়। (কীভাবে? কতক্ষণ ধরে?)

৪. নির্দেশ অনুযায়ী কর্তা, কর্ম (মুখ্য ও গৌণ) এবং ক্রিয়া বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে বিভিন্ন মৌলিক বাক্য রচনা করো :

৪.১

বাক্য

কর্তা — কর্ম — ক্রিয়া

(____ ____) (____) বই দিল।

বাক্য
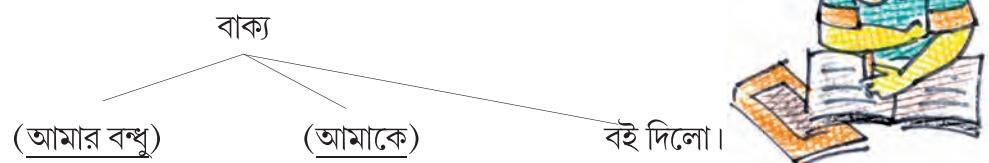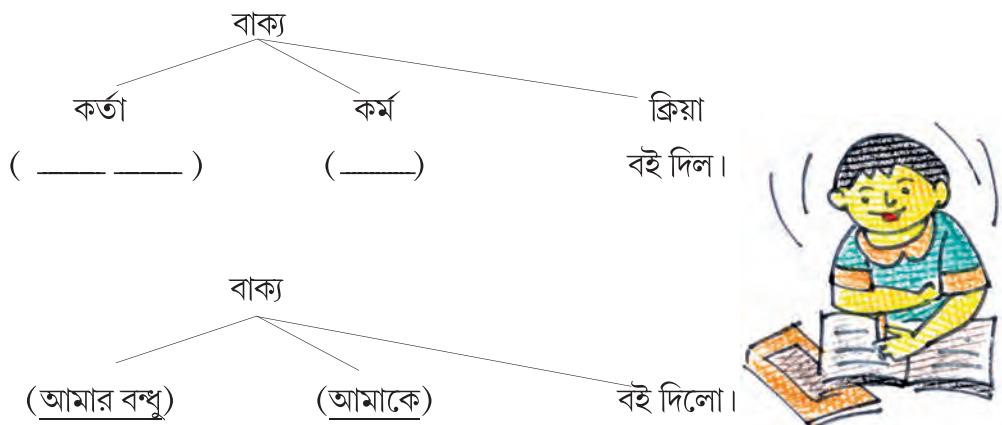
(আমার বন্ধু) (আমাকে) বই দিলো।

বাক্যটি হলো : আমার বন্ধু আমাকে বই দিল।

৪.২

বাক্য

কর্তা — গৌণকর্ম — মুখ্যকর্ম — ক্রিয়া

(____) (____) (____) পড়ান।

বাক্যটি হলো : ______________________________।

৪.৩

বাক্য

কর্তা — ক্রিয়া

(____ ____ ____) (____ লেখে)

বাক্যটি হলো : ______________________________।

৪.৪

বাক্য

কর্তা — কর্ম — ক্রিয়া

সব ভারতীয়ই (____) (________)
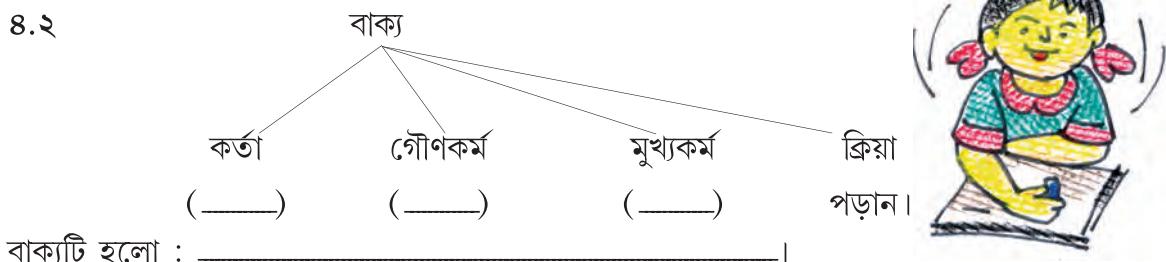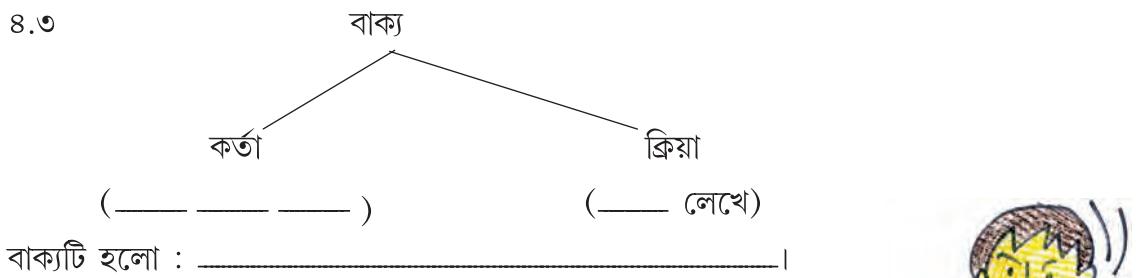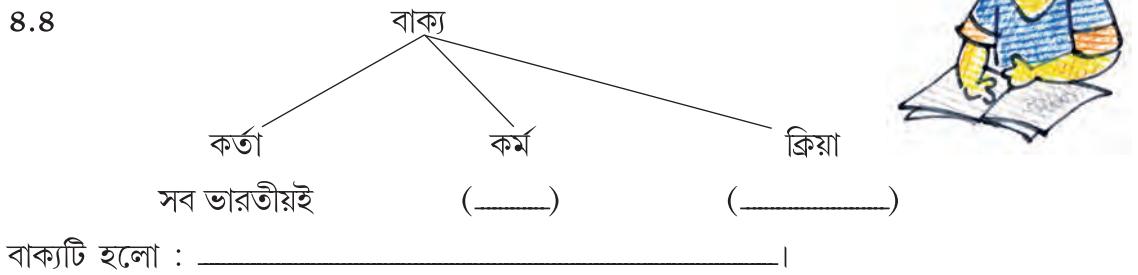
বাক্যটি হলো : ______________________________।

যতি-চিহ্ন
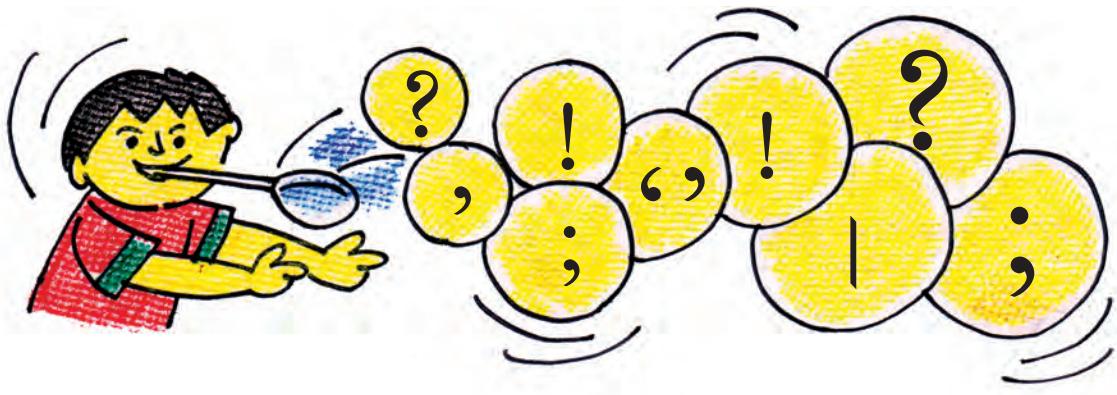
টিফিনের সময় যখন সব ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসের বাইরে, তখন চুপিচুপি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলাম:

ক্লাসে সবাই চলে এল। ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাটা এর মধ্যেই কয়েকজনের নজরে পড়েছে। তারপর ধীরে ধীরে সবাই এই লেখাটা দেখল।

বলো তো, এই লেখাটার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব আছে কি না?

একজন বলল যে সুভাষ ও রঞ্জন নামের দুটি লোক কথা বলছে। আরেকজন বলল যে যেন মনে হচ্ছে রঞ্জন সুভাষকে ভ্যাঙাচ্ছে। সুভাষ যা বলছে রঞ্জন তো সেটাই বলছে।

আমি বললাম, বেশ। এইবার এর মধ্যে আমি কয়েকটা চিহ্ন বসাচ্ছি। দেখো তো ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।

সুভাষ : ভালো?

রঞ্জন : ভালো।

সুভাষ : বাজারে?

রঞ্জন : বাজারে।

সুভাষ : আর কী খবর? সব ঠিকঠাক চলছে?

রঞ্জন : খবর আর কি! চলছে সব ঠিকঠাক।

দেখলে কয়েকটা চিহ্ন দিতেই কেমন একটা মানে ফুটে উঠল। বোঝা গেল দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। আসলে আমরা যখন বলি, তখন একটানা বলি না। কেন বলি না? এর দুটো কারণ আছে। একটা কারণ তোমরা আগেই জেনেছ। আমরা তো নিশ্বাসবায়ুতে অর্থাৎ যে বায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে সেই বায়ুতে কথা বলি। কিন্তু যদি আমরা শ্বাস না নিই তাহলে নিশ্বাসবায়ু আসবে কোথা থেকে? তাই শ্বাস নেওয়ার জন্য আমাদের থামতে হয়। আর একটানা কথা বলে গেলে কথার মানে পরিষ্কার হয় না। সব জট পাকিয়ে যায়।

আমি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখলাম,

নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলবেন। না ফেললে জরিমানা হবে।

এবার কেউ যদি 'না'-এর পর থামো, তাহলে কী দাঁড়ায়?

নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলবেন না। ফেললে জরিমানা হবে।

এই কথাটি কি আমরা বলতে চেয়েছি? তোমরা কী বলো? সবাই তো হেসেই অস্থির। বলল, 'না' এর পরে নয়, আগে থামতে হবে। তাহলেই ঠিক মানেটা পাওয়া যাবে।

তাহলে দেখো ঠিক জায়গায় না থামলে কথার মানে বোঝা যায় না। এই যে আমরা থামি, এই থামার ধরনের উপর নির্ভর করে কয়েকটা চিহ্ন দেওয়া হয়। এগুলোকে আমরা যতিচিহ্ন বা বিরামচিহ্ন বলি। যদি আমার মনের ভাব কোনো বাক্যে বলা হয়ে যায় তাহলে আমরা একটু বেশিক্ষণ থামি। এর চিহ্ন দাঁড়ি । ভালো নাম পূর্ণচ্ছেদ। ছেদ মানে থামা। আর পূর্ণচ্ছেদ মানে শেষ হয়ে যাওয়া কোনো বাক্য।

এরপর এল কমার প্রসঙ্গ। বললাম, দাঁড়ি মানে একেবারে দাঁড়িয়ে যাওয়া, আর কমা মানে অল্প একটু থামা। এই থামলেই বাক্যের অর্থটা পরিষ্কার হয়ে যায়। যেমন ধরো,

আরামে হাঁ করে ঘুমুচ্ছে টেনিদা, থেকে থেকে বলছে, দে ক্যাবলা, আর একটু ভালো করে চুলকে দে।

বুঝতেই পারছ যে এতবড়ো বাক্য একটানা বলা মুশকিল। যদি বা একটানা বলা যায় কিন্তু বাক্যের অর্থ পরিষ্কার হবে না। তাই জায়গায় জায়গায় 'কমা' দিতেই, একটু দাঁড়াতেই, অর্থটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

শুভ্র বলল, তাহলে 'কমা' দেওয়ার কি নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই? বাক্যটা পড়ে বুঝে নিতে হবে?

দুটোই ঠিক। নির্দিষ্ট জায়গাও আছে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বুঝেও নিতে হয়। যেমন ধরো, বন্ধুরা মিলে বেড়াতে যাচ্ছ। তখন বন্ধুদের নাম বলার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটার পরে কমা দিতে হয়।

রাবেয়া, রত্না, শুভ্র, কৌশিক আর প্রবাল দার্জিলিঙে যাবে।

এখানে দেখো প্রত্যেকটা নামের পাশে কমা বসেছে, শুধু কৌশিকের পরে বসেনি। যদি কৌশিকের পরে 'আর' শব্দটা না থাকতো তাহলে বসতো।

সুজয় বলল, দার্জিলিং ছাড়াও আরো কয়েকটা জায়গায় গেলে তখন কি কমা বসবে?

নিশ্চয়ই। যখনই একই ধরনের একাধিক জিনিসের কথা বলব, তখনই এইভাবে কমা বসবে—

রাবেয়া, রত্না, শুভ্র, কৌশিক আর প্রবাল দার্জিলিং, কার্শিয়াং আর কালিম্পঙে যাবে।

তবে আরো কয়েকটা জায়গায় কমা বসে—

যেমন এই গল্পের বইটা, তাঁর কথা অনুযায়ী, অসাধারণ।

এখানে দুটো বাক্য লুকিয়ে আছে, (১) এই গল্পের বইটা অসাধারণ। (২) তাঁর কথা অনুযায়ী অসাধারণ। প্রথম বাক্যটির মধ্যে যখন দ্বিতীয় বাক্যটি ঢুকিয়ে দেওয়া হলো তখন তার আগে ও পরে কমা দিতে হলো। এরকম আরো কয়েকটা বাক্য

- জায়গাটা, আমি আগেই বলেছিলাম, একেবারে ভালো নয়।
- লাল কলমটা, যেটা গতকাল কিনেছিলাম, কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

প্রবাল বলল, আমি দেখছি যখন কেউ কথা বলে, তখন তার কথা কমা দিয়ে শুরু হয়,আর কথাটা দুটো উলটো কমা দিয়ে বোঝানো হয়।

তুমি ঠিক লক্ষ করেছ। একটা উদাহরণ দিই:

বুকু এসে বলল, 'মা আসছেন'।

যখন আমরা এইভাবে কারো কথা বলি, তখন তার কথাটাকে আমরা দুইদিকে দুটো ঊর্ধ্বকমার মধ্যে রাখি। একে উদ্ধৃতিচিহ্ন বলে। আর উদ্ধৃতি শুরু করার আগে 'কমা' দিতে হয়।

এছাড়াও কোনো বিশেষ নাম, কোনো বিশেষ শব্দ বা ঘটনার উল্লেখ উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখা হয়। যেমন— 'সহজ পাঠ' আর 'বর্ণপরিচয়' শিশুদের অবশ্যই পড়া উচিত।

আরো দুটো চিহ্নের কথা তোমাদের বলব। প্রশ্নচিহ্ন আর বিস্ময়সূচক চিহ্ন। তবে আমার বলার আগে তোমরা বলো কখন এই দুই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। রাবেয়া বলল, কোনো কথার মধ্যে যদি প্রশ্নের ভাব থাকে, তাহলে বাক্যের শেষে প্রশ্নচিহ্ন হয়। যেমন, 'সহজ পাঠ' কার লেখা? ঠিক। রাবেয়া ঠিকই বলেছে। তাহলে বিস্ময়সূচক চিহ্ন কোথায় বসে?

কিংশুক বলল, নামের মধ্যেই বলা আছে, বিস্ময় মানে অবাক। যখন অবাক হয়ে কোনো কথা বলা হয়, তখন সেই কথার শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন হয়। যেমন— আঃ! কী দারুণ দৃশ্য!

কিংশুক ঠিক বলেছে। কিন্তু শুধু বিস্ময় প্রকাশ করলে বা অবাক হলেই যে বিস্ময়সূচক চিহ্ন হয় তা নয়, রেগে গেলে বা প্রতিবাদ করলে, আনন্দ পেলে, ভয় বা যন্ত্রণা প্রকাশ করলে, আরাম বা স্বস্তি পেলেও বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে। যেমন, রেগে গেলে বা প্রতিবাদ করলে—

- কী বললে, আমি পাগল!
- এত সাহস! আমাকে মিথ্যুক বললে!

আনন্দ পেলে—

- বাঃ! দারুণ খবর!

ভয় বা যন্ত্রণা প্রকাশের ক্ষেত্রে—

- আকাশে কী মেঘই না করছে!
- ওরে বাবা! আমি মরেই যাবো!

আরাম বা স্বস্তি পেলে—

- আঃ! বাঁচা গেল!
- ভাগ্যিস তুমি এলে!

তাহলে দেখতে পাচ্ছো বিস্ময়সূচক চিহ্ন শুধুই বিস্ময়ের জন্য নয়, আরো অনেক কিছুর জন্যই।

হাতে কলমে

১. পাশের ঝুড়ি থেকে বিভিন্ন যতি-চিহ্ন নিয়ে নীচের অনুচ্ছেদগুলির জায়গামতো বসাও: (? | , ‘ ’ !)

১.১ শুনেই তো ভয়ে বাঘের প্রাণ উড়ে গিয়েছে সে ভাবলে যে নিশ্চয় শিয়াল তাকে ফাঁকি দিয়ে নরহরি দাসকে খেতে দেওয়ার জন্য এনেছে। তারপর সে কী আর সেখানে দাঁড়ায় সে পঁচিশ হাত লম্বা এক-এক লাফ দিয়ে শিয়ালকে সুদ্ধ নিয়ে পালাল শিয়াল বেচারা মাটিতে আছাড় খেয়ে কাঁটার আঁচড় খেয়ে ক্ষেতের আলে ঠোক্কর খেয়ে একেবারে যায় আর কী শিয়াল চেঁচিয়ে বললে মামা আল মামা আল তা শুনে বাঘ ভাবে বুঝি সেই নরহরি দাস এল তাই সে আরও বেশি করে ছোটে

১.২ চলতে চলতে এক জায়গায় দেখলাম পথের উপর প্রকাণ্ড গাছ পড়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম আমাদের হাতি দুটো এ গাছ ডিঙোবে কী করে ভাবতে ভাবতে গাছটার উপর চড়তে আরম্ভ করলাম আর অমনি আমার পায়ের নীচেই যেন একটা কী হুড়মুড় করে উঠল জিজ্ঞেস করলাম কেয়া হ্যায় রে শ্যামলাল বললে হুল্লুমান হোগা হুজুর

১.৩ ১৯০৩ সালের শেষাশেষি আবার তাঁরা তাঁদের জাহাজে ফিরে এলেন এবং ঠিক করলেন এবারকার মতো ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হবে কিন্তু নতুন বিপদ ঘটল সামনের সমস্ত পথ বরফে বন্ধ হয়ে গেছে বারো মাইল পর্যন্ত ঘন বরফ পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল তাঁরা নানারকমের যন্ত্র দিয়ে সেই বরফ কেটে পথ তৈরি করতে লাগলেন কিন্তু কিছু দিন চেষ্টা করে বুঝলেন এ অসাধ্যসাধন

১.৪ ইছামতী যেন লক্ষ্মী মেয়েটি অতি শান্ত তার চলার গতি ইছামতীতে এলে পর তীরের দিকে নৌকো সরিয়ে এনে কম জল দেখে দুজন মাঝি হাঁটু জলে লাফিয়ে পড়ে হাতে তাদের মোটা দড়ি মোটা কাঠি তীরে উঠে এবারে তার গুণ টানতে থাকে নৌকোয় বাঁধা লম্বা দড়ির আর এক মাথা মোটা কাঠির সঙ্গে বেঁধে কাঠিটা ঘাড়ে চেপে ধরে নদীর পাড় দিয়ে চলতে থাকে মাঝিরা সে রশির টানে নৌকোও এগিয়ে চলে জলের উপরে তরতর করে

১.৫ কে কাঁঠাল চুরি করেছ ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে তিনি জানতে চাইলেন কেউই অপরাধ স্বীকার করতে নারাজ তাই দেখে জ্যোতি কবুল করল সে একাই কাঁঠাল পেড়েছে এবং বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছে কিন্তু যেহেতু এগুলো তাদেরই ইস্কুলের গাছের ফল সেজন্য ওগুলো পেড়ে খাওয়াকে চুরি বলে সে মানতে পারে না

২. **নীচের অনুচ্ছেদগুলিতে প্রয়োজনমতো বিরামচিহ্ন বসাও :**

২.১ এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায় পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়

২.২ লিখিত ভাষার আর মুখের ভাষার মূলে কোনো প্রভেদ নেই ভাষা দুয়েরই এক শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন একদিকে স্বরের সাহায্যে অপর দিকে অক্ষরের সাহায্যে বাণীর বসতি রসনায় শুধু মুখের কথাই জীবন্ত যতদূর পারা যায় যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়

২.৩ রাগি মানুষ কথা কইতে না পারলে যেমন ফুলে ফুলে ওঠে সকালবেলাকার মেঘগুলোকে তেমনি বোধ হলো বাতাস কেবলি শ ষ স এবং জল কেবলি বাকি অন্তস্থ বর্ণ হ য ব র ল নিয়ে চণ্ডীপাঠ বাধিয়ে দিলে আর মেঘগুলো জটা দুলিয়ে ভ্রূকুটি করে বেড়াতে লাগল অবশেষে মেঘের বাণী জলধারায় নেবে পড়ল

২.৪ একদিন কমলমীরে পৃথ্বীরাজের চর এসে খবর দিল সঙ্গ বেঁচে আছেন শ্রীনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের উদ্‌যোগ হচ্ছে সকালে পৃথ্বীরাজ সেজেগুজে সঙ্গকে ধরবার জন্য বার হবেন এমন সময় শিরোহি থেকে পৃথ্বীরাজের ছোটোবোন এক পত্র পাঠালেন

২.৫ একসময়ে হঠাৎ দেখি সবাই স্বদেশী হুজুগে মেতে উঠেছে এই স্বদেশী হুজুগটা যে কোথা থেকে এল তা বলতে পারি নে এল এইমাত্র জানি আর তাতে ছেলে বুড়ো মেয়ে বড়োলোক মুটে মজুর সবাই মেতে উঠেছিল সবার ভিতরেই একটা তাগিদ এসেছিল কিন্তু কে দিলে এই তাগিদ সবাই বলে হুকুম আয়া

৩. প্রদত্ত যতিচিহ্নগুলিকে মাথায় রেখে শূন্যস্থানে শব্দ বসিয়ে মৌলিক বাক্য লেখো (একটি উদাহরণ দেওয়া রইল):

৩.১ শুভ্র, বাদল, রত্না আর রাবেয়া বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।

৩.২ ________, '________________।'

৩.৩ ______, ________, ________।

৩.৪ '________', ________।

৩.৫ ________, ________।

৩.৬ ________, '________________?'।

৩.৭ ________, '________________!'।

৩.৮ ________ , ________________?

৩.৯ '______!', ________।

৩.১০ ________________?

প্রতিশব্দ

ক্লাসে ঢুকতেই সুজয় বলল, ‘স্যার, প্রতিশব্দ ব্যাপারটা কী ? তালিকা করতে হবে?’

রাবেয়া বলল, ‘তালিকা করতে হবে কেন? একটা করে শব্দ আর একটা তার প্রতিশব্দ।’

ওদিক থেকে ফিরোজ চেঁচিয়ে উঠল, ‘একটা শব্দের ক’টা প্রতিশব্দ হয়?’

ক্লাসজুড়ে একটা হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, ‘সবাই এখনই চুপ করো। যার যা প্রশ্ন এক -একজন ক’রে করলেই হয়। এত হট্টগোল কেন?’

আমি গম্ভীর হয়ে যেতেই ক্লাসের সবার সম্বিৎ ফিরল। এক মুহূর্তে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল ক্লাস। আমি বললাম, ‘ প্রতিশব্দ কাকে বলে সেটা আগে জানতে হবে তোমাদের। চঞ্চল, তুমি বলো তো প্রতিধ্বনি ব্যাপারটা কী?’

চঞ্চল বলল, ‘পাহাড়ে বা কোনো ফাঁকা জায়গায় গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে কিছু বললে একটু পরে সে কথাটাই ফিরে আসে। তাকে বলে প্রতিধ্বনি।’

‘ঠিক বলেছ। ধ্বনি- প্রতিধ্বনি যেমন একটা অন্যটার সঙ্গে যুক্ত; ঠিক তেমনই শব্দ আর প্রতিশব্দ। আরো পরিষ্কার করে বলি, ধ্বনির আওয়াজটুকু কেবল প্রতিধ্বনিতে ফিরে আসে। কিন্তু শব্দ আর প্রতিশব্দে অর্থটাই হয়ে ওঠে প্রধান।’

অবন্তী আর সুরঞ্জনা একসঙ্গে বলল, ‘কিছু বুঝতে পারলাম না।’

‘একটু ভাবো তাহলেই বুঝবে। ঠিক আছে, সহজ একটা দৃষ্টান্ত নাও। সেকেন্ড বেঞ্চে বসে আছ সমীর আর ফোর্থ বেঞ্চে মলয়। দুজনেই উঠে দাঁড়াও তো। সমীর, তোমার নামের অর্থ কী?’

সমীর বলল, ‘বাতাস।’

‘আর তোমার, মলয়?’

মলয় বলল, ‘ঐ একই, বাতাস, মানে বায়ু।’

আমি বললুম, ‘পবনও বলতে পারো। তাহলে বলা যায় তোমরা দুজন, নামের দিক থেকে দু-জনের প্রতিশব্দ। আরো তিনটে প্রতিশব্দ এই সুযোগে বলা হয়ে গেছে ক্লাসে। বায়ু, পবন আর বাতাস।’ শুভ্র বলল, ‘হাওয়াও তো হতে পারে, তাই না?’
আমি বললুম, ‘ঠিক বলেছ। বুঝতে পেরেছ সবাই? শব্দ আর তার প্রতিশব্দে আসলে মিলটা থাকে অর্থের। একটার বদলে অন্যটা বসানো যায়।’

অবন্তী হাত তুলেছে দেখে বললাম, ‘হ্যাঁ, বলো, তোমার কী প্রশ্ন আছে?’

অবন্তী বলল, ‘প্রশ্ন নেই। আমার পিসির দুজন কলেজের বন্ধু আছে। একজনের নাম রাত্রি, অন্যজনের নাম নিশা। এরা প্রতিশব্দ নয়?’

আমি বললাম, ‘চমৎকার। এরকমভাবে এক একটা শব্দ নিয়ে খুঁজে দেখো তো কটা প্রতিশব্দ পাও।’

রাবেয়া অনেকক্ষণ উশখুশ করছিল। এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

‘এরকম শব্দ তো বাংলায় অনেক আছে। সবকটা খুঁজে বের করব কী করে?’

আমি বললাম, ‘ঠিকই তো। কিন্তু, সবইতো ক্লাস ফোরে করে ফেলতে বা জেনে ফেলতে বা মুখস্থ করতে বলা হচ্ছে না। মোটামুটিভাবে প্রতি দু-সপ্তাহে দুটি শব্দ আর তার প্রতিশব্দ শিখে নেওয়াটাই জরুরি।’

রাবেয়া বলল, ‘আমি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটা কবিতা জানি। সেটা মনে রাখলে অনেকগুলো শব্দ আর প্রতিশব্দ এমনিই শেখা হয়ে যায়। বলে, গড়গড় করে বলে গেল —

রবি ভাস্কর সূর্য তপন অরুণ মিহির অর্ক।
দুই পণ্ডিত দেখা হলেই বাধবে তুমুল তর্ক।।

ইন্দু শশী মৃগাঙ্ক চাঁদ বিধু সোম সুধাংশু।
বাবার পায়ে হাওয়াই চটি, দাদুর পায়ে পামশু।।

জগৎ ভুবন বসুন্ধরা পৃথিবী মহী বিশ্ব।
ট্রেন চললে দেখবে বাইরে পিছু হাঁটছে দৃশ্য।।

আকাশ গগন দ্যৌ আশমান নভ অম্বর ব্যোম।
ভয়ের কথা মনে পড়লেই খাড়া হয়ে যায় লোম।।

জল অপ্ পানি নীর পয় বারি অম্বু।
বাস্কেটবল খেলায় দেখা একাই একশো লম্বু।।

স্রোতস্বতী তরঙ্গিনী গাঙ নদী সরিৎ।
ও তো কেবল বন্ধু নয়, প্রকৃতই সুহৃৎ।।

জমি মাটি স্থল ভূমি মৃত্তিকা ভূপৃষ্ঠ।
কেরোসিনের লম্বা লাইন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতিষ্ঠ।।

আমি আবার বললাম, ‘দারুণ বলেছ! প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়াটা সত্যিই একটা মজার খেলা হতে পারে। কোনো শব্দের প্রতিশব্দ, ধরো, কিছুতেই তুমি খুঁজে পাচ্ছ না। তখন যাবে মাস্টারমশাই বা দিদিমণির কাছে। ওঁরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবেন। মনে রেখো, এই প্রতিশব্দের আরেকটা বাংলা ‘প্রতিশব্দ’ হলো সমার্থ-শব্দ বা সমার্থক শব্দ। হাসছ কেন সুজয়?’

শেষ প্রশ্নটা সুজয়কে করতেই হলো। সেকেন্ড বেঞ্চে বসে ও ক্রমাগত হাসছে মুচকি-মুচকি। সেটা আমার নজর এড়ায়নি। সুজয় তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলল, ‘হঠাৎ মনে পড়ল, বাবা পড়াতে বসিয়ে দাদাকে মাঝে-মাঝে বলেন মাথামোটা। কখনো-কখনো বলেন, আহাম্মক। এটাও তো প্রতিশব্দ? সেই কথাটা ভেবেই হেসে ফেলেছিলাম।’

আমি বললাম, ‘হুম্। যা বলেছ তা অবিশ্যি ষোলোআনা ঠিক। যদিও অন্য কেউ বকা খেলে তা নিয়ে হাসাহাসি করাটা ঠিক নয়। আহাম্মক, মাথামোটা বা নির্বোধ এরা প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতিশব্দ। আপাতত একেকটা শব্দের দুটো করে প্রতিশব্দ জানলেই চলবে।’ একটু ভেবে ওদের জন্য একটা
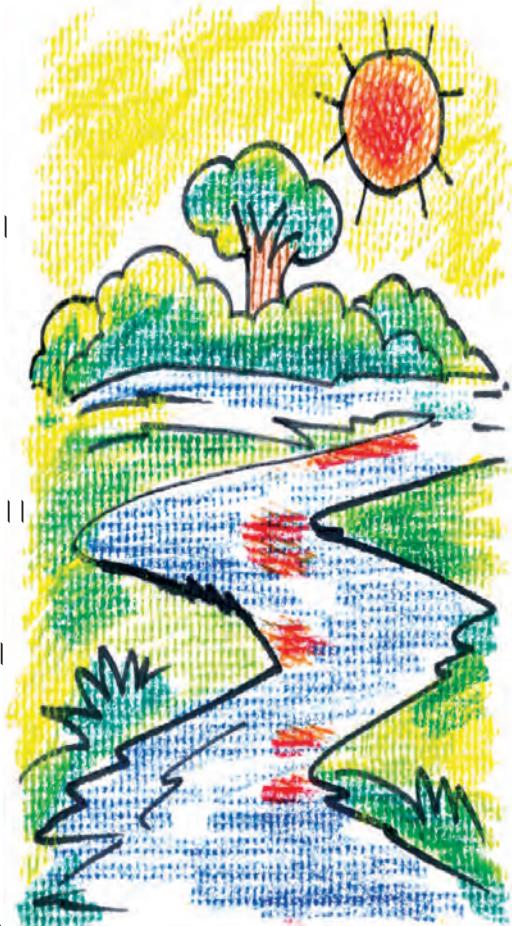
নমুনা বোর্ডে লিখে দিলাম। সেটা এরকম —

শব্দ	প্রতিশব্দ
পথ	সড়ক, মার্গ।
গৃহ	আবাস, ভবন।
হাতি	গজ, করী।
বাগান	উদ্যান, কানন।
পৃথিবী	বিশ্ব, জগৎ।

পরের দিন আবার ফিরোজ জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, খামোখা এই প্রতিশব্দগুলো খুঁজে পেতে এনে খাতায় লিখে ফেলব কেন?'

আমি বললাম, 'সেটা সহজেই বুঝতে পারবে। প্রতিশব্দ জানা মানে শব্দভাণ্ডার বেড়ে যাওয়া। দুটো-চারটে -সাতটা এভাবে প্রতিশব্দ জানলে শব্দভাণ্ডার বাড়বে আর লেখার সময় দেখবে প্রতিশব্দ বসিয়ে অর্থাৎ একই শব্দ বারবার ব্যবহার না করে, অন্য শব্দ বসিয়ে দিলে লেখার মধ্যে একটা মাধুর্য তৈরি হয়। কবিতাতেও হতে পারে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটা বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি শোনো —

"কেনে এত ফুল তুলিলি সজনী ভরিয়া ডালা
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী তারার মালা
আর কি যতনে
কুসুম রতনে
ব্রজের বালা?"

দেখো, ফুলের প্রতিশব্দ হিসেবে কুসুম ব্যবহৃত হলো। তার ফলে কী সুন্দর শোনাল বলো?'

রাবেয়া বলল, 'স্যার, এখানে রাত্রির বদলে রজনী শব্দও তো মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যবহার করেছেন। এটাও তো প্রতিশব্দ, তাই না?'

আমি বললাম, 'দারুণ বলেছ! আর হৈ-হট্টগোল নয়, নিশ্চয়ই সবাই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ। এবার প্রতিশব্দ খোঁজার খেলায় নেমে পড়ো। যেকোনো চেনা শব্দ দিয়ে শুরু করতে পারো। তারপর ডুব দাও শব্দের অন্তহীন সাগরে।'

দিনলিপি

তখন টিফিনবেলা। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে না বাজতেই ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস থেকে বেরোলো। এবার সকলে হাত ধুয়ে মিড-ডে মিলের খাবার খাবে। হঠাৎ চোখে পড়ল চার মূর্তি গাছতলায় দাঁড়িয়ে কী সব আলোচনা করছে। চার মূর্তি মানে রাবেয়া, সুজয়, অবন্তী আর শুভ্র। চার জনেই এবছর ক্লাস ফোরে উঠল। আমি বললাম 'কী ব্যাপার? তোমরা এত চিন্তিত মুখে কেন?' শুভ্র বলল, 'স্যার, আপনি আমাদের একটু সাহায্য করবেন?' আমি বললাম, 'সাহায্য, সে কী! কী রকম সাহায্য তোমরা আমার কাছ থেকে চাও?' এবার মুখ খুলল রাবেয়া, 'আমাদের ক্লাস টিচার সুচরিতাদি ক্লাসের শেষে হঠাৎই বললেন, আমাদের দিনলিপি লেখা শিখতে হবে। আমাদের সিলেবাসে আছে। আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, দিনলিপি ব্যাপারটা কী!' রাবেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই সুজয় যোগ করল, 'পরীক্ষায় কি আসবে? পরীক্ষার দিনটার বিবরণ?' শুভ্র বলল, 'আমাদের ক্লাস ফোরে *পাতাবাহার* বইয়ে এসব কিছু নেই। আলাদা ব্যাকরণ বই যেটা, 'ভাষাপাঠ' সেটায় কিছুটা আছে।' আমি হেসে ফেললাম। বললাম, 'তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবো, আগে একটা কাজ করো, চট করে গিয়ে স্কুলে রান্না হওয়া খাবার খেয়ে নাও। তারপর আমার ক্লাসে চলে এসো।' চারমূর্তি তাড়াতাড়ি মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে আমার কাছে ছুটে এলো।

আমি বললাম, 'তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ডায়েরি দেখেছ?' এতক্ষণ চুপচাপ ছিল অবন্তী। হঠাৎ এই প্রশ্নে একগাল হেসে বলল, 'আমি তখন থেকে বলছি, ডায়েরি লেখাই হলো দিনলিপি, ওরা মোটে কানেই তুলছে না। আমার ছোটো পিসেমশাই রোজ ডায়েরি লেখেন। আমি দেখেছি লিখতে।' আমি বললাম, 'কথাটা অবন্তী ঠিকই বলেছে। আমি ধাপে ধাপে বলি। ডায়েরিতে দেখবে প্রত্যেক দিনের তারিখ দেওয়া, বছর লেখা এক-একটা পাতা থাকে। যদি একেবারে পয়লা জানুয়ারি থেকে প্রত্যেক দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিখে রাখা যায়, তাহলে বছরের শেষে প্রতিদিন কী কী ঘটল সারা বছর জুড়ে তার বিবরণ পাবে। তখন দেখবে, কত কিছু ভুলে গেছ, কোথায় কোথায় কত স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে, একটার ঘাড়ে অন্যদিনের ঘটনা ঢুকে গেছে। ঐ ডায়েরিটাকে মনে হবে, তোমার জীবনের নির্ভুল ইতিহাস।' রাবেয়া বলল, 'ঐটাই বুঝি দিনলিপি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ঐ যে প্রত্যেকদিনের ঘটনা লিখে রাখছ, ওটাকেই বলে দিনলিপি লেখা। বিদেশে, বিশেষত ইংরেজদের মধ্যে ওকে বলে ডায়েরি লেখা। সুবিধে হলো, প্রত্যেক পাতায় সাল-তারিখ ছাপাই রয়েছে। আলাদা করে লিখতে হলো না। অবন্তীর পিসেমশাই নিশ্চয়ই সেভাবেই একটা ডায়েরিতে দিনের ঘটনা লিখে রাখেন। তাই না অবন্তী?' অবন্তী মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল। সুজয় জিজ্ঞেস করল, 'ডায়েরিতেই কি দিনলিপি লিখতে হবে? তাহলে তো প্রথমে একটা ডায়েরি কেনা দরকার।' আমি বললাম, 'তা কেন? একটা খাতাতেও হতে পারে। তবে, অন্তত ৩৬৫টা পাতা সে খাতায় থাকতে হবে। নইলে প্রতিদিনের জন্য বরাদ্দ পাতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপর প্রত্যেক পাতার ওপর সেদিনের তারিখ আর সালটা তুমি নিজেই লিখে নাও। ব্যাস, লিখে ফেলো দিনলিপি।'

অবন্তী বলল, 'সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কুর গল্প পড়িসনি? সেখানেও তো তারিখ দিয়ে দিয়ে ঘটনার পর ঘটনা লেখা আছে।'

আমি বললাম, 'বাঃ। খুব ভালো বলেছ। ঐটাই তো দিনলিপি। প্রোফেসর শঙ্কুর কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি তো অনেক। সেই সিরিজের প্রথম বইটার নামই তো ছিল, 'প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়েরি'। সবকটা গল্পই ঐরকম দিনলিপির আকারে লেখা।'

এবার রাবেয়া বলল, 'কিন্তু এক-একদিনের কতবড়ো হবে? একপাতায় যদি না ধরে?'

আমি বললাম, 'এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ভেবে দেখো, আমি বলেছিলাম দিনলিপিতে থাকবে দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে একপাতার মধ্যে ধরাতে পারলেই হলো। তবে খুব বড়ো ঘটনা যদি ঘটে, একপাতা পেরিয়ে যেতেই পারে। সেক্ষেত্রে ডায়েরির চেয়ে বেশি উপযোগী হলো দিনলিপি লেখার খাতা। সেখানে তুমি ইচ্ছেমতো তারিখ দিয়ে পাতা বানাতে পারো। তবে বড়ো লিখতে লিখতে রোজ তিন-চারপাতা লিখে ফেলো না। তাহলে দিনলিপি পড়তে পড়তে বছর শেষে হাঁপিয়ে উঠবে।'

শুভ্র ঝটিতি প্রশ্ন করল, 'এমন দিনও তো যায়, যেদিন কিছুই ঠিক উল্লেখযোগ্য ঘটেনি।'

আমি বললাম, 'সেদিন খুব সংক্ষেপে সেই কথাটুকুই উল্লেখ করবে। তবে, মনে রেখো, কিছু তেমন ঘটেনি বলে দিনলিপি লেখা বন্ধ করবে না কখনো। প্রতিদিন তারিখ দিয়ে সে দিনের কথা লেখার অভ্যাসটা তৈরি করা জরুরি। এর ফলে, নিজের কথা লেখার পাশাপাশি, ভাষার ওপর, শব্দের ওপর দখল বাড়ে অজান্তেই। নিয়মিত শৃঙ্খলার অনুশীলনও হয়। তারপর, বিভিন্ন ঘটনা, রংবেরঙের অনুভূতি, বিভিন্ন পরিস্থিতির বর্ণনা এসমস্ত ভাষায় প্রকাশ করার দক্ষতাও বাড়ে। আর, দিনলিপি লেখার একটা অদ্ভুত মজা আছে। একেবারে নিজের কথা লিখতে লিখতে ঐ খাতাটা বা ডায়েরিটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো হয়ে যায়।'

রাবেয়া বলল, 'অবন্তীর পিসেমশাইয়ের মতো অনেকেই কি ডায়েরি লেখেন রোজ?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই। বিশেষত সাহিত্যিক বা শিল্পীরা। দেশে-বিদেশে অনেক বরেণ্য লেখক তাঁদের ডায়েরি প্রকাশও করেছেন। অনেকের ডায়েরি বা দিনলিপি আবার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে। কত অজানা কথা, কত অচেনা তথ্য সেসব দিনলিপি থেকে জানা গেছে। এই ধরো, আমাদের পরিচিত দু'তিনজন লেখকের কথা। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ। বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি দিনলিপির ধরনে লিখতে

পছন্দ করতেন। এমনিতে দিনলিপি অবশ্য তিনি লিখতেন না। ঐসব ভ্রমণবৃত্তান্ত কেবল ডায়েরির মতো দিন ধরে ধরে লেখা। এরকম একটি বিখ্যাত বই হলো 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি'। এছাড়াও আছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ। এঁরা প্রত্যেকেই নিয়মিত দিনলিপি লিখতেন।'

সুজয় জিজ্ঞেস করল, 'ঐ দিনলিপি কি প্রকাশিত হয়েছে? আমি ইচ্ছে করলে পড়তে পারি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তা পারবে মোটামুটি। আচ্ছা, দু-একটা নমুনা কাল স্কুলে নিয়ে আসব। তোমরা দেখলে, একটা আন্দাজ অন্তত পাবে, কীভাবে লিখবে দিনলিপি। চিন্তার কিছু নেই। চলো এবার। সন্ধে হয়ে আসছে।'

সবাই এগোলাম যার-যার বাড়ির পথে। পরের দিন স্কুলে দিনলিপির নমুনা হিসেবে যা ওদের দেখিয়েছিলাম, সেগুলো সবার সামনে তুলে ধরলাম এখানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

মানুষ যে মানুষের পক্ষে কত সুদূরের জীব তা য়ুরোপে আমেরিকায় গেলে বুঝতে পারা যায়। সেখানকার সমাজ হচ্ছে দ্বীপশ্রেণি — ছোটো এক এক দল জ্ঞাতির চারি দিকে বৃহৎ অজ্ঞাতির লবণসমুদ্র; পরস্পরসংলগ্ন মহাদেশের মতো নয়। জ্ঞাতি শব্দটা তার ধাতুগত বিশেষ অর্থে আমি ব্যবহার করছি; অর্থাৎ, যে কয়েকজনের মধ্যে জানাশোনা আছে, আনাগোনা চলে; আমাদের দেশে পরস্পর আনাগোনার জন্য জানাশোনার দরকার হয় না। আমরা তো খোলা জায়গায় রাস্তার চৌমাথায় বাস করি। একে আমাদের আয়ু কম, তার উপরে অবাধ সামাজিকতায় পরস্পরের সময় নষ্ট ও কাজ নষ্ট করতে আমাদের সংকোচমাত্র নেই।

আবার অন্যপক্ষে, ভোগের আদর্শ যেখানে অত্যন্ত বেশি ব্যয়সাধ্য, সুতরাং যেখানে সময়-জিনিসটাকে মানুষ টাকার দরে যাচাই করতে বাধ্য, সেখানে মানুষে মানুষে মিল কেবলই বাধাগ্রস্ত হবেই, আর সেই মিল যতই প্রতিহত ও অনভ্যস্ত হতে থাকবে ততই মানুষের সর্বনাশের দিন ঘনিয়ে আসবেই। একদিন দেখা যাবে, মানুষ বিস্তর জিনিস সংগ্রহ করেছে, বিস্তর বই লিখেছে, বিস্তর দেয়াল গেঁথে তুলেছে, কেবল নিজে গেছে হারিয়ে। মানুষ আর মানুষের কীর্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ভেঙে গিয়েছে বলেই আজ মানুষ খুব সমারোহ করে আপন গোরস্থান তৈরি করতে বসেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২ আগস্ট, ১৯২৭ সাল

সকালে হাওড়ায় চেপে কেমন বর্ষাস্নাত মেঘমেদুর ভূমিত্রীর মধ্যে দিয়ে সারাদিন ট্রেনে করে এলাম! নিউ কর্ড লাইনের দুধারে কেমন সবুজ বর্ষাসতেজ গাছপালা ঝোপ-ঝাপ, ধানের মাঠ। বাড়িতে বাড়িতে রান্না চাপিয়েছে — ঘরে ঘরে যে সুখদুঃখের লীলাদ্বন্দ্ব চলছে। কেমন ঘরের পেছনে খড়ের ঘরের কানাচে ছোটো ডোবায় পদ্মবনগুলি! বড়ো বড়ো পদ্ম পাতাগুলো উল্টে রয়েছে, সাদা সাদা পদ্ম ফু'টে — কেমন যেন সব ভাই বোন নীল আকাশের দিকে চেয়ে সারাদিন পদ্মের চাকা তুলে তুলে যায়

— এই ছবি মনে আসে। মাঠের ধারের বনে দীর্ঘ ছাতিম গাছটা, নীচে আগাছার বনজঙ্গল। বীরভূমের মাঠে মাঠে ছোটো ছোটো চাষার চালা ঘর, লাউ কুমড়োর লতা উঠেছে রাঙামাটির দেয়াল বেয়ে, মেয়ে ছেলেরা গাড়ি দেখছে — সেই যে ছোটো ঘরখানা থেকে গাড়ির শব্দ শুনে মা মেয়ে ছুটে বার হ'য়ে এল, আমার এসব কথা আজীবন মনে থাকবে।

দিনলিপি-১

১০ অক্টোবর, ২০১৩

আজ সোমবার। সকাল থেকেই আকাশ রোদ-ঝলমলে। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের সঙ্গে রুপোলি রোদের খেলা। সারাদিনটা বেশ কাটালাম। খুব মজা হলো। বর্ষায় ধোওয়া সবুজ পাতার মতো আনন্দে

মাতলাম সারাদিন। ব্যাপারটা হলো এই যে আজ আমার বন্ধু বন্দনার জন্মদিন। সকাল থেকেই ভাবছিলাম কখন যাব ওদের বাড়ি। বিকালে পড়ন্ত রোদের মিটি মিটি হাসির মধ্যে স্কুল থেকে বাড়িতে ঢুকেই বেরিয়ে পড়লাম। বন্ধুর বাড়ি গিয়ে খুব আনন্দ করব। সবার আগে আমিই হাজির হয়েছি। তারপর একে একে অমিত, রিনি, সৃজন, মালা, মানবী, আসিফ আর সকলে। ওদের বাড়িতে বেশ হৈ হৈ ব্যাপার... নানা রকমের খেলা, গানের লড়াই, সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া আরও কত কী... ! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, প্রিয় বন্ধুকে আমি সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' বইটা উপহার দিয়েছি। ওকে বইটা দিতেই কাকিমা হেসে বললেন, 'আবার এসব কেন? খুব বড়ো হয়ে গেছিস না!' আমি তো সবে ক্লাস ফোরে পড়ি। আমি কি সত্যিই বড়ো হয়ে গেছি?

দিনলিপি-২

২০ ডিসেম্বর, ২০১৩

গভীর রাত। চারিদিকে ঘন জঙ্গল। মাঝনদীতে নৌকো ঢেউয়ে অল্প দুলছে। ডেকের চেয়ারে চাঁদের আলোয় একলা বসে আছি। রাতচরা পাখির ডাক কানে আসে। সারাদিন নৌকো চলেছে। অজস্র ছবি তুলেছি। সজনেখালি, সুধন্যখালি, নেতাধোপানির ঘাট, আরও কত দেখার জায়গা! গাইড সুন্দরবনের কত গা ছমছমে গল্প বলছিলেন! দুপুরের নরম রোদে নৌকোতেই স্নান-খাওয়া সেরেছি। চোখে ঘুম নেই। কত রঙিন নৌকো... কত মানুষ... পাড়ে নাম-না জানা গাছ, পাখি... কুমির রোদ পোহাচ্ছে... এত সুন্দর জায়গাও

আমাদের রাজ্যে আছে! পড়ন্ত বিকালে নদীর জলে সূর্যের ছায়াটা কী অপূর্ব দেখাচ্ছিল! সন্ধ্যায় গ্রামের মানুষেরা যাত্রা অভিনয় করেছিল। কী অসাধারণ লাগল! সুন্দরবন থেকে ফেরার পথে আমি একটা বই কিনে নিয়ে যাব, সুন্দরবনকে নিয়েই লেখা। শীতের শেষে একবার সুন্দরবনে আসব। শুনেছি তখন গাছে গাছে নানা ফুল ফোটে। মৌমাছি ওড়াউড়ি করে মধু সংগ্রহ করবে বলে।
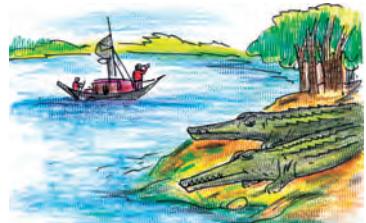
মাঝিরা গান গাইছে। মুগ্ধ হয়ে শুনছি। জানি, ফিরে গেলে এমন রাত আর ফিরে পাব না কখনো। ভোরের আকাশে আলো ফোটার আর কত দেরি আছে?

অনুচ্ছেদ

ক্লাসে ঢুকতেই সুজয় আর শুভ্র পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বলল, 'একটা প্রশ্ন আছে আমাদের।'

আমি বললাম, 'বলে ফেলো।'

শুভ্র বলল, 'আমাদের পাড়ায় *বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার* একটা অনুচ্ছেদ-রচনা প্রতিযোগিতা করছে। আমি আর সুজয় তাতে নাম দিয়েছি। কিন্তু, অনুচ্ছেদ রচনা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'এটা খুব শক্ত কিছু নয়। তবে, যে জিনিস সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তার প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে ফেলাটা ভালো কথা নয়। বিষয় কি বলে দিয়েছে?'

শুভ্র বলল, 'হ্যাঁ। ''সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি''। আরো একটা আছে, ''বৃষ্টির দিন''। আগামী রবিবার সকাল দশটায় লাইব্রেরির মাঠে প্রতিযোগীদের বসে লিখতে হবে।'

আমি বললাম, 'ক্লাসে এমন কেউ আছো যে এ বিষয়ে ওদের সাহায্য করতে পারো?'

সিরাজুল বলল, 'আমি পারি। অনেক সময় বড়ো একটা লেখায় অনেকগুলো অনুচ্ছেদ থাকে। একটা বিষয়ে বা একজনকে নিয়ে একটা অনুচ্ছেদ, আবার অন্য কথা বললে বা অন্য কাউকে নিয়ে কথা বললে পরের অনুচ্ছেদ শুরু হবে।' আমি বললাম, 'কোনো লেখা দেখলে আরো ভালো বোঝা যাবে।'

ওপাশ থেকে দীপা হাত তুলল। 'আমি আজ আমাদের গতবছরের বাংলা বই ''পাতাবাহার'' ব্যাগে এনেছি। ওটা দেবো?'

তৃতীয় শ্রেণির 'পাতাবাহার' নিয়ে সিরাজুলকে বললাম, 'তোমার কথাটা এ বইয়ের কোনো লেখা দেখিয়ে বোঝাতে পারো?' সিরাজুল বইটা নিয়ে উল্টেপাল্টে খানিক দেখে বলল, 'এই যে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাথি' লেখাটা। দেখুন,

তালগাছ কেবলই তাদের ডাকে পাতাগুলো নেড়ে নেড়ে; কিন্তু তাকে একলা রেখে যে-যার দৌড়ে পালায়, খেলতে ছোটে। তেপান্তর মাঠে একলা নিশ্বাস ফেলে — বৃথা আঁকুপাঁকু করে — তদের সঙ্গে চলতে চায় — পারে না।

একদিন কোথা থেকে দুটি বাবুইপাখি সেই তালগাছের কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগল। ...

তালগাছ নিয়ে কথা হচ্ছিল একটা অনুচ্ছেদে। এবার বাবুইপাখির কথা যেই এল, শুরু হলো আরেকটা অনুচ্ছেদ।' আমি বললাম, 'সাবাস! খুব ভালো বুঝিয়েছো।'
ওপাশ থেকে রঞ্জন বলল, 'স্যার, ইংরেজিতে ওটাকেই তো প্যারাগ্রাফ বলে, তাই না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। অনুচ্ছেদের ইংরেজিই হলো প্যারাগ্রাফ। ব্যাপারটা একই। রচনায় অনেক অনুচ্ছেদ থাকতে পারে। কিন্তু অনুচ্ছেদ তুলনায় আকারে ছোটো। ওই দশ-বারোটা বাক্য। পুরো ধারণাটা কি স্পষ্ট হলো? আর কেউ অনুচ্ছেদ লেখা নিয়ে কিছু বলবে?'

প্রবাল বলল, 'আমরা যেরকম ''বাক্য বাড়াও'' করি। অনেকটা সেইরকম।'

আমি বললাম, 'কিন্তু প্রবাল, ''বাক্য বাড়াও'' যখন করো, প্রথম বাক্যটা তো দেওয়া থাকে। এখানে তো তেমন কিছু নেই। তবে, তোমার কথা পুরোটা ফেলে দেওয়াও যাবে না। বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রথম বাক্যটা লিখে তারপর এগোনো যেতে পারে।'

সুজয় বলল, 'তাহলেই হবে? এ তো সোজা ব্যাপার।'

আমি তখন সুজয়ের কাছে গিয়ে বললাম, 'পুরোটা এত সরল নয়। ধরো, তুমি একটা মূর্তি বানাচ্ছ। মানুষের মূর্তি। তার মাথাটা এতো বড়ো আর পা-টা এইটুকু কিংবা হাতের আঙুল খুব ছোট্টো — তাহলে ভালো দেখাবে না। আবার পা-টা বিরাট, মুণ্ডুটা একরত্তি। সে মূর্তিও চলবে না। সবসময় মনে রাখবে একটা সামঞ্জস্য যেন থাকে। অনুচ্ছেদও একটা মূর্তির মতো। তার ভূমিকা, মূল বিষয়, প্রাসঙ্গিক তথ্য আর উপসংহার — ঐটুকু জায়গায় সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করতে হবে। পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কে নেই, এমন এলোমেলো দশ-বারোটা বাক্য লিখলেই হবে না। সংক্ষেপে, অথচ খুব গুছিয়ে বিষয়টা একটা অনুচ্ছেদে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হবে।'

রাবেয়া এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। সে হঠাৎ বলল, 'আমার মনে হয়, অনুচ্ছেদ অনেকটা গল্পের মতো। একটা শুরু থাকবে, একটা মাঝখান থাকবে আর একটা শেষ থাকবে।'

আমি বললাম, 'খুব ভালো বলেছ। সুজয়, শুভ্র, দুজনকেই বলছি। আজ ছুটির পর বাড়ি ফিরে দুজনেই লিখে ফেলো তো ঐ দুটো বিষয়ে দুটো অনুচ্ছেদ। কাল আমি দেখব সে-দুটো খসড়া। তারপর আলোচনা হবে।'

শুভ্র বলল, 'কালই করতে হবে? আসলে আজ বিকেলে মিলন-বীথি ক্লাবের সঙ্গে আমাদের ফুটবল সেমি ফাইনাল আছে। আমি তো গোলকিপার, আমাদের 'সবুজ দল' ক্লাবের। আমার স্যার পরশুর আগে হবে না। কালকের দিনটা ছেড়ে দিন, স্যার।'

কী আর বলি! বললাম, 'ঠিক আছে। কাল শুভ্র লিখে আনবে। আমরা আলোচনা করব। তুমি পরশু এনো।'

হঠাৎ দেখি, ক্লাসের বাইরে শান্তনুদা। বললেন, 'আর কতক্ষণ এই ক্লাস চলবে?'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমি স্তম্ভিত! কথায়-কথায় অনেক সময় চলে গেছে। গোটা স্কুল ছুটি হয়ে গেছে; খেয়ালই করিনি। সবাইকে বললাম, 'আর কথা নয়। ছুটি আজ।' অবন্তী হাত তুলল। আবার প্রশ্ন? বললাম, 'কোনো প্রশ্ন আছে? বলো।' অবন্তী বললো, 'না স্যার, প্রশ্ন নয়। বলা যায়, আমাদের অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনায় এবার পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। তাই না?'

একটি শীতের সকাল

আজ বড়োদিন। গত পরশুদিনই বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরোল। গতকাল মা-বাবার সঙ্গে চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর বিড়লা তারামণ্ডল দেখে এলাম। জন্মদিনে পাওয়া টিফিনবক্সে কেক, কমলালেবু তো ছিলই, বাইরেও আবদার করে পছন্দের অনেক জিনিস ও পেয়েছি। আজ জিশু খ্রিস্টের জন্মদিন। গতকালই পার্কস্ট্রিটে আলোর সাজ দেখছি। গির্জাগুলো কত সুন্দর করে সাজানো! অ্যাকাডেমিতে ছোটোদের নাটক চলছে। যা ঠান্ডা পড়েছে! লেপের নীচে শুয়ে শুয়ে একটু আগেও ফেলুদার গল্প পড়ছিলাম। এখন শুধু ভাইয়ের সঙ্গে খুনশুটি। ক্যালেন্ডারের শেষ পাতাটার দিকে তাকাই আর ঠাসা পরিকল্পনায় ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠি... জ্বর, সর্দি-কাশির কথা আজ না-ই বা ভাবলাম। কুয়াশায় এখন চারিদিক সাদা হয়ে আছে। কুয়াশা কেটে রোদ বেরোতেই আমিও শুরু করব আমার আরেকটা ছুটির দিন — শুধুই আমার মতো করে কাটাতে। ইস্কুলের মাঠে ফুটবল নামাতেই সেটা শিশিরে ভিজে এক্সা হবে। অনেক ছোটাছুটি করে শীতের সকালেও ঘামতে থাকব। ফিরে একটু পরে উঠেই বাবার সঙ্গে বাজারে যাব।

শীতে কতরকম রঙিন শাক-সবজির ভিড় ! সকাল দশটা বাজতেই বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা। শীতঋতু আমার ভীষণ প্রিয়। ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল... কত খেলা ! আর নতুন গুড়ের পিঠে-পায়েস। দুপুরে মায়ের হাতে তৈরি আচার... ইংরাজি বছরের শেষ, নববর্ষ, বইমেলা ... উৎসবের ভিড় ...

আমার প্রিয় খেলা

খেলা অনেক রকমের হয় । কোনো খেলার জন্য লাগে মাঠ ,আবার কোনো খেলা ঘরের ভিতরেও খেলা যায়। কোনো খেলা অনেকে মিলে খেলে , আবার কোনো খেলার জন্য লাগে দুজন। একা-একা খেলা যায় এ রকম খেলাও আছে। তবে আমার সেইসব খেলাই পছন্দ যেখানে আছে গতি, সহখেলোয়াড়দের সঙ্গে বোঝাপড়া, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ এবং অবশ্যই বুদ্ধি। আমি ক্রিকেট, ফুটবল, টেবল টেনিস, দাবা সব খেলাই খেলি । এইসব খেলার মধ্যে আমি আনন্দও পাই। দাবা-য় আক্রমণ ও বিপক্ষকে বুদ্ধির জোরে বেঁধে ফেলা, টেবল টেনিসে নিয়ন্ত্রিত শক্তি ও ছন্দ, ক্রিকেটের ধৈর্য ও শক্তির মিশেল আমাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু এ সব কিছুই আমি খুঁজে পাই ফুটবলের মধ্যে। বল পায়ে গতি , বিপক্ষকে কাটিয়ে আক্রমণ করা এবং আক্রমণ প্রতিরোধ করে প্রতি আক্রমণে যাওয়া , বুদ্ধি করে জায়গা পরিবর্তন করে বিপক্ষকে বোকা বানিয়ে দেওয়া, নিজের দলের খেলোয়াড়ের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া এবং সবশেষে পাস-ড্রিবল-ডজ- শটের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি করা এক অপরূপ সৌন্দর্য— ফুটবলের মধ্যে সবই আছে। তাই সব খেলার মধ্যে ফুটবল খেলাই আমার প্রিয়। একটা সাদা-কালো চামড়ার বল আর সবুজ মাঠ আমার মন জুড়ে থাকে। কীভাবে বিপক্ষের ডিফেন্সকে তছনছ করা যায়, ঘুমের মধ্যেও আমি সেই ছবি দেখি। আর সব শেষে লক্ষ্যপূরণ। বিপক্ষের গোলে বল ঠেলে দেওয়া। এই লক্ষ্য কখনো পূরণ হয়, কখনো হয় না। তাই কখনো আনন্দ, কখনো খারাপ লাগা। চেষ্টা করি সবক্ষেত্রেই যেন ঠিক থাকি, আনন্দে বা দুঃখে ভেসে না যাই। বাবা বলেন জীবনটাও ফুটবল খেলার মতোই। মাঠে নামলে তাই বাবার কথাটাই মনে পড়ে।

শিখন পরামর্শ

ভাষার মধ্যে এমন কিছু বিষয় আছে, যা আমরা কথা বলার সময় বা লেখার সময় ব্যবহার করলেও, কেন এ রকম ঘটে তা আমরা খেয়াল করি না। ব্যাকরণ পড়ার সময় অনেকক্ষেত্রে তা আমরা হয়তো পড়েছি, মনে রেখে পরীক্ষা দিয়েছি, কিন্তু স্মৃতিনির্ভর হওয়ায় হারিয়ে গেছে সেই সব। একটি জীবিত ভাষাকে দেখার নানা ধরনের কথা আজ সারা বিশ্বে আলোচিত হচ্ছে। 'ভাষাপাঠ' বইটি সেই কথাগুলি মাথায় রেখেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

কথা বলার সময়ে মুখের ভিতরে কী ঘটে তা জানা জরুরি, কেননা তাছাড়া ধ্বনি এবং ধ্বনিসংক্রান্ত বিষয়টি বোঝা সম্ভব হয় না। তাই আমরা প্রথমেই এ নিয়ে আলোচনা করেছি 'কথাবলার যন্ত্রপাতি' অংশে। ধ্বনিবিষয়ক যা কিছু আলোচনা করবেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই চেষ্টা করবেন ধ্বনির উৎসস্থলকে চিহ্নিত করতে। 'স্বরসন্ধি' যেহেতু আসলে ধ্বনিরই বিষয়, সেখানে সূত্রগুলি কীভাবে জন্ম নিচ্ছে তাও একইভাবে দেখানো দরকার।

বাক্যের ক্ষেত্রে নমুনা হিসেবে কয়েকটিমাত্র বাক্য নিয়েই আমরা আলোচনা করেছি। আরো অনেক বাক্য আসুক উদাহরণ হিসেবে, এটাই কাম্য। ঐ অধ্যায়ের শুরুতে ছাত্রছাত্রীদের বাক্য নিয়ে খেলার প্রসঙ্গ রয়েছে। বাস্তবেও এমন খেলায় ওদের নিয়মিত ব্যস্ত রাখুন। একই কথা যতিচিহ্ন নিয়ে।

প্রতিটি পাঠের শেষে যে 'হাতেকলমে' আছে, সেটি শুধুই নমুনা। এরকম অনেক কাজ আপনারা তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের সামনে রাখুন। নিয়মিতভাবেই লিখতে দিন অনুচ্ছেদ, বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ে। চর্চা করুন প্রতিশব্দ নিয়েও।

ব্যাকরণপাঠের মধ্যে যে যান্ত্রিকতা আছে, তা থেকে মুক্ত করার জন্য, ভাষার নিয়মকে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে বিষয়টিকে সরস ও আনন্দময় করে তোলার জন্য আমরা এই বিশেষ পদ্ধতিতে পাঠগুলি বিন্যস্ত করেছি। পাশাপাশি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলিও অনুসরণ করা হয়েছে। আমরা চেয়েছি ভাষাপাঠের ক্লাস মুখস্থবিদ্যা আর যান্ত্রিক অনুশীলনের পরিবর্তে যেন হয়ে ওঠে যুক্তিনির্ভর আর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনাসাপেক্ষ আর সব মিলিয়ে অবশ্যই চিত্তাকর্ষক।